সুকুমার রায়

লীলা মজুমদার

সুকুমার রায়

লীলা মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ সত্যজিৎ রায় সমীপেষু,

মানিক, তোমার অনন্যসাধারণ মা-বাবার কথা মনে করে, এই বই তোমাকে দিলাম। তুমি তাঁদের যোগ্য সন্তান। তোমার অন্য রকম মা-বাবা থাকলে, তুমিও অন্য রকম হতে।

গ্রন্থকার
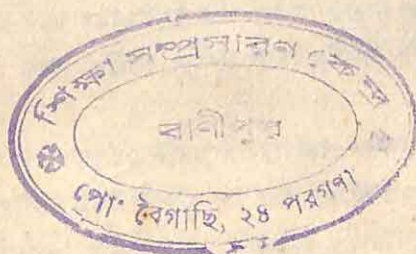
এই লেখিকার
একটি বিখ্যাত রচনা

আর কোনোখানে

১৩৭৫ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত

ভূমিকা

সুকুমার রায়কে আমরা বড়দা বলতাম। তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আমার বাবা প্রমদারঞ্জন রায়ের মেজদা ছিলেন। আগে মেজদার নাম ছিল কামদারঞ্জন। কিন্তু তাঁর চার-পাঁচ বছর বয়সে তাঁর-ই একজন দূর সম্পর্কের কাকা তাঁকে দত্তক নিয়ে, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নাম দিয়েছিলেন। কাকার নাম ছিল হরিকিশোর রায়চৌধুরী। সুকুমার কিন্তু কখনো চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন নি। তিনি ও তাঁর ভাইরা পদবী লিখতেন শুধু রায়। মধ্যম ভাই সুবিনয় মাঝে মাঝে রায়চৌধুরীও লিখতেন।

আমার বাবার হাতে লেখা একটি খাতায় আমাদের বংশ পরিচয় পেয়েছি। আগে রায় স্থানে আমাদের পদবী ছিল 'দেব'। কিন্তু তারো আগে লেখা হত 'দেও'। আমাদের পরিবার সম্ভবতঃ বিহার থেকে এসে বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী হয়েছিল। সম্ভবতঃ মুসলমান সরকারী চাকরি করে এই রায় উপাধি পাওয়া। আমাদের বংশ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ, সিদ্ধমৌলিক। গোত্র মৌদ্গল্য ; প্রবর ঔর্বচ্যবন ভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবং। গাঞি কর্ণ সেনাপতি।

আমাদের পূর্বপুরুষরা আগে নদীয়া জেলায় চাকদহ গ্রামে বাস করতেন। সেখান থেকে অনুমান ১৫৮০ সালে, রামসুন্দর দেব ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে আসেন।

অবিশ্যি সে-সময় ময়মনসিংহ বলে কোনো জায়গা ছিল না। তবে সেরপুর নগরটি ছিল। তখন ওদিকে প্রসিদ্ধ বারো ভূঁইয়ার একজন, ঈশা খাঁর প্রবল প্রতিপত্তি ছিল।

রামসুন্দর দেব সেরপুরের জমিদারের বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। পরে যশোদলের রাজবাড়ির একটি কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। এই সময় থেকেই আমরা নিজেদের ময়মনসিংহের সন্তান বলে মনে করি। আমাদের বাড়ি ছিল মসূয়া গ্রামে। বাড়ির পাশ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী বয়ে যেত। সে-বাড়ি আর নেই। নদীও অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

কিন্তু তার কলকল শব্দ আমাদের বংশের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছড়া গাঁথতেন, গান লিখতেন। অঙ্কে আর জমি জরিপের কাজে তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ধর্মে তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল। সামাজিক বিষয়ে উদারতা ছিল।

উপেন্দ্রকিশোর দেশের পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে, ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, ছোটদের জন্য বই রচনা করা, ফটোগ্রাফি ও ফটো ছাপা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন পাঠ নিয়েছিলেন আর গবেষণা করেছিলেন। ইউরোপে ছবি ছাপার যে হাফ-টোন ব্লক-প্রিন্টিং-এর প্রচলন ছিল, তার তিনি উন্নতিসাধন করেছিলেন। তাঁর প্রণালী বিলেতের বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করেছিলেন। পেনরোজ পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে তাঁর নাম আছে। বড়দাও বিলেতে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর বাবার পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে।

বড়দা ছিলেন বড় ছেলে। তাঁর-ও যে ছবি ছাপার দিকে মন যাবে, এ আর বিচিত্র কি। বাড়ির একতলায় নিজেদের প্রেস ছিল। ফটকের উপরে লেখা ছিল ইউ রায় এণ্ড সন্স। ঐ ছিল বড়দার যথার্থ পরিবেশ। ঐখানেই তাঁর কাজের আরম্ভ ও শেষ।

উপেন্দ্রকিশোর যখন ব্রাহ্ম হয়ে, সেকালের বিখ্যাত সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করলেন, তখন তিনি সেকালের একটা বলিষ্ঠ সামাজিক জীবনের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারলেন। সুখের বিষয় তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমে রুষ্ট হলেও, শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে গভীর স্নেহের বন্ধনটি অটুট ছিল। এই পরিবেশে সুকুমার জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভার বিকাশের জন্য এই নবীন সমাজের উদার নির্ভীক দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য ভালো ছিল।

তখন সবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব তখনো প্রবল। তখনকার যুবকদের মধ্যে দেশ-প্রেমের একটা বন্যা ডেকেছিল, যার ফলে যার যা শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, সে-সবই একটা উজ্জ্বল স্বদেশী রূপ নিয়ে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই যুবকরা অনেকেই শিক্ষার জন্যে বিদেশে গিয়ে অল্পবিস্তর সময় কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁদের বাঙ্গালীত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং বলিষ্ঠ হয়েছিল। বড়দা এ দেরই একজন। বড়দার ছেলে সত্যজিৎও উত্তরাধিকারসূত্রে এই দুর্লভ গুণটি লাভ করেছে। এতে মানুষ একটা প্রবল স্বকীয়তা পায়। সেই স্বকীয়তার জোরে বড়দা আমাদের পরিবারকে আলো করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমার পনেরো বছর বয়স ছিল, তখনো স্কুলে পড়ি। তাঁরি উৎসাহে সাহিত্য

সেবায় আমার তখন সবেমাত্র হাতে-খড়ি হয়েছিল। তার আগের বছর তাঁর অনুরোধে সন্দেশের জন্যে একটা গল্প লিখেছিলাম। সেটিকে ছাপার অক্ষরে দেখে আমার যেমন গর্ব, তেমনি লজ্জা হয়েছিল। কারণ লেখাটি বড় কাঁচা। তারপর অনেক বছর আর গল্প লিখি নি। কেবলি নিজেকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সময় থেকেই আমার নাড়া-বাঁধা হয়ে গেছিল।

জীবনে যদি কারো চেলা হয়ে থাকি, সে আমার বড়দার। এমন প্রবল পৌরুষের সঙ্গে এত কোমল সরসতার মিল আর কোথায় পাব? এত কথা, এত গান, এত হাসি, এত প্রাণ আর কোথায় দেখব? এই বইয়ে বড়দার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলোই শুধু দিতে পেরেছি। তাঁর লেখা কবিতা—গল্পের, তাঁর আঁকা ছবির একটুখানি পরিচয়-ই শুধু দিয়েছি। তাতেই যদি লোকে তাঁকে খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাঁর প্রচণ্ড মানবতার দিকটা দিতে পারি নি। বই থেকে মানুষটা-ই হয়তো বাদ পড়ে গেছে।

ছেচল্লিশ বছর আগে যে মানুষ চলে গেছে, তাকে ধরে দেওয়া বড় সহজ নয়। তার গম্ভীর গলার স্বর, তার কৌতুকে ভরা চোখ দুটি, তার দুপ্-দুপ্ করে বাড়িময় ছোটা-ছুটি, তার অবিরাম স্নেহের ধারা—এ-সব কি দেওয়া যায়? শুধু নিজের মনের মধ্যে জমা করে রাখার জিনিস এ-সব। এখনো বড়দার বইগুলি পড়লে, তিনি আমার চোখের সামনে দেখা দেন। তাঁকে মনে করলেই, তিনি আমার কলমে রস যোগান। এ হারানো ঠিক হারানো নয়, বরং বেশি করে পাওয়া। তবু তাঁর শূন্য আসনের কথা মনে করলে কষ্ট হয়। কত তাঁর দেবার ছিল, নেবার লোক-ও কত ছিল, কিন্তু হাতে এতটুকু সময় ছিল না। যে-টুকু রেখে গেছেন, দেশের লোক মুঠো ভরে তাই নিক। এক বোঁটায় দুই ফুল, হাসি কান্না, হাত পেতে নিক তারা। এর বেশি আর কি বলা যায়?

গ্রন্থকার
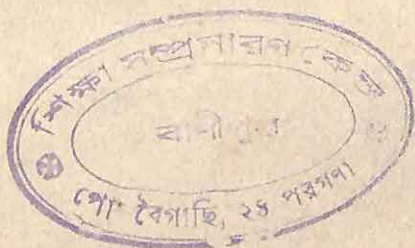
এক

পঞ্চাশ বছরের পুরানো একটা খাতা, কালচে রঙ ধরা লাল খেরোয় বাঁধানো, ময়লা দড়ি দিয়ে জড়ানো। প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, হিজিবিজি খাতা, উড়ো খাতা, ফালতো খাতা, এমনি খাতা, বাজে খাতা, খসড়া খাতা, জাবেদা খাতা।

চলন্তিকায় জাবেদার মানে দেওয়া আছে দৈনিক হিসাবের খাতা। এ খাতাটাও একটা মানুষের মনের নোট বই। প্রথম পাতার উপরের কোণায় ছোট্ট করে তারিখ লেখা, মে ১৯১৮ আর নিচের কোণায় আরো ছোট করে একটি নাম লেখা, সুকুমার রায়।

ভিতরে পাতায় পাতায় আঁকিবুঁকি, ছবি, নক্সা,—একটা দাড়িওয়ালা মুখের ছবির নিচে লেখা 'নাজিমোভা'—কবিতার খসড়া, প্রবন্ধের কাঠামো, পেনসিলে কিম্বা কালিতে, এলোমেলো, যেমন তেমন, মানুষের মনের মতন। তারি মধ্যে এক জায়গায় কাটাকুটি সহ লেখা আছে,

> "রসের মাঝে মজবি যদি মন,
> বাস্তবের এই বস্তুলীলার তত্ত্ব কথা শোন্।
> জড়জগতের বাস্তুভিটায় বস্তু করেন বাসা,
> নিংড়ে দেখ রসের মধু মৌচাকে তাঁর ঠাসা!"

এই চিন্তাটাই ছিল এই অসাধারণ মানুষটির মনের মূলে; এরি মধ্যে তাঁর অসাধারণত্বের বীজ। বাস্তব আর রস, গাম্ভীর্য আর হাসি উল্টো জিনিস নয়, একসঙ্গে তারা লেপটে থাকে। বিজ্ঞান আর কাব্যও পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পরকে তারা সম্পূর্ণতা দেয়, অর্থময় করে তোলে। অর্থাৎ আয়নার পিছনে যেমন পারাটুকু মাখানো থাকবে, কাচের উপর আলো পড়বে, তবেই না তাতে জীব-জড়ের ছবি ফুটে উঠবে, তেমনি বাস্তবের গায়ে রসের প্রলেপ লেগে

থাকবে, তার উপর বুদ্ধির আলো পড়বে, তবেই না সত্যকে চেনা যাবে।

মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে যদি এই অসাধারণ মানুষটির আয়ু শেষ হয়ে না যেত, তা হলে ধ্বনি আর অক্ষরকে তিনি কি সমৃদ্ধি দিয়ে যেতে পারতেন কে জানে। বিজ্ঞান ও রসজ্ঞান, যারা অখণ্ড ও এক, যাদের মধ্যে বিরোধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব, তাদের মর্ম নিয়ে এত ভুল বোঝাবুঝি হয়তো তিনি অনেকখানি ঘুচিয়ে দিতেন। তাঁর একটি অসম্পূর্ণ রচনা 'বর্ণমালাতত্ত্বে' তিনি লিখেছিলেন,

'পড় বিজ্ঞান, হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া এ দীন ছুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে জড় সন্ধিতে, বস্তু পিণ্ড ফাঁকে,
অণু অবকাশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।

(অর্থাৎ inter molecular space এ-ও আকাশের কণিকা থাকে)।

হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড আকাশ প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধনে বদ্ধ আকাশে, আকাশ বাঁধন জড়ে,
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে!

সুকুমার রায়ের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সূচনাতেই এত কথা বলতে হয়, তার কারণ—বেশির ভাগ লোকের ধারণা হল যে সুকুমার রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে তিনি আবোল-তাবোলের আবিষ্কারক এবং কে না জানে যে ছোটদের জন্য লিখতে হলে আবোল-তাবোলই সব চাইতে সহজ। মানের বালাই নেই অথচ কান বেশ খুশি হয়। অনেক অনুকারকও দেখতে দেখতে জুটে গেল যাদের রচনাতে না রইল অর্থ, না রইল রস। সুকুমার রায়ের দোহাই দিয়ে অনেক সমালোচকও এদের সমর্থন করলেন। ফলে বাংলার শিশু-সাহিত্যের পিঠে এক বিষম বোঝা চেপে গেল।

সব চাইতে মজার কথা হল সুকুমার রায় নিজে কখনও এমন

একটিও পদ রচনা করেন নি, যার মধ্যে অর্থ এবং রস দুই-ই নেই। যা অসম্ভব ও অপ্রকাশিত, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়, তাকে যদি কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, অরূপ ও অপরূপকে যদি রূপ দিতে হয়, তা হলে তা কি রকম দাঁড়ায়, সুকুমারের লেখা আর আঁকার মধ্যে তার নমুনা দেখা যায়। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আঁচড় অর্থে আর রসে টৈটুম্বুর।

ধ্বনিকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন যে হেলায়-ফেলায় শব্দ ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অভিধানে উল্লিখিত শব্দই হক আর লোকমুখে ব্যবহৃত শব্দই হক, উচ্চারিত ধ্বনিই হক বা লিখিত অক্ষরই হক, শব্দের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন।

'কলম ও কালি' নামক তাঁর ছোট্ট একটি কবিতাতে হাসির ছলে এই শ্রদ্ধার কথাটি কেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, যথা :—

'মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে।
আঁচড়ে আঁকিতে আখর কটি,
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি।
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।
মারে না ধরে না হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
সাদায় কালোয় কি খেলা জানে,
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।'

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে সুকুমার রায় আবোল-তাবোল নাম দিয়ে বই লিখলেও, আবোল-তাবোলের আবিষ্কারক তিনি নন, বরং সব দেশের লোক-কথা চিরকাল আবোল তাবোল দিয়ে ঠাসা। যে সব আবোল-তাবোল কালের পরীক্ষায় পাস

করেছে, সেগুলিকে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপও বলা যায় না, কারণ অনুপ্রাস ও ধ্বনিগত তাৎপর্যের ফলে তারা ক্রমে রস এবং রূপ দিয়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে, তখন আর তাদের অর্থ নেই এ কথা বলা চলে না।

সুকুমার রায় অবশ্য এভাবেও আবোল-তাবোল লেখেন নি; অর্থের বাঁধন কেটে দিলে কি অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে তাই নিয়েই তাঁর গোটা একটি নাটিকা রচিত হয়েছিল। সে নাটিকার নাম শব্দ-কল্পদ্রুম, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে।

সারা জীবন ধরে তিনি 'হিউমর'কে,—অর্থাৎ বাংলায় যাকে হাস্য-রস, কিম্বা শুধু রস বলে, তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রসের ব্যবহার ছিল না এ কথা বলা যায় না; কিন্তু তার কোনো মর্যাদাই ছিল না। হয় সে ছিল ভাঁড়ামি, গম্ভীর নাটকের দুটি গম্ভীর দৃশ্যের মাঝখানে, দর্শকদের হাঁপ ছাড়বার অবকাশ দেবার উদ্দেশ্যে, একটুখানি সঙের খেলার মতো। নয়তো সে ছিল তীব্র শ্লেষে ভরা ব্যঙ্গরচনা। রসরচনা আর ব্যঙ্গরচনার মাঝখানে অতল সাগর বয়ে যায়। সম্মান পাবার যোগ্য নির্ভেজাল রস বাংলায় খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। সে রস পরিবেশন করার আধারও বড় একটা চোখে পড়ত না।

এ ধরনের রসকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে হয় না, এ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতিশয় প্রকট। এর একটি সাধারণ ও সর্বজনীন দিক আছে, যাকে চিনতে ছেলেবুড়ো কারও বেশি বিদ্যার দরকার হয় না; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করার শক্তি ধরে অতি অসাধারণ দু-এক জনা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনেকেই কোনো না কোনো সময়ে রসরচনা লিখেছেন। হুতোম প্যাঁচা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং আরো কেউ কেউ ব্যঙ্গরচনায় দক্ষ। এসব রচয়িতারা চোখে বিচারকের ঠুলি এঁটে অন্য লোকের দোষ-দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের পাত্রের সঙ্গে এক আসনে বসেন নি। নিছক হাস্যরসের পরোক্ষ

কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায় না। সুকুমার রায়ের আগে আমাদের দেশে এ ধরনের লেখক বেশি চোখে পড়ে না। সেকালের যাত্রার পালা যাঁরা লিখতেন তাঁরা এই ভাবধারাটি খানিকটা বুঝলেও, তাঁদের রচনা উঁচুদরের সাহিত্যের স্তরে উঠতে পারে নি। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের অনেক লেখার মধ্যেই এই শ্লেষ-শূন্য রসের অবতারণা দেখা যায়, কিন্তু তাঁর রসরচনার মন-কেমন-করা ভাবের জন্য অনেক সময়েই হাসির সঙ্গে কান্না পায়। কাজেই তাকে অনাবিল হাস্যরস বলা যায় না। আবার মাঝে মাঝে তাঁর অতিশয় উদ্ভট কল্পনা শক্তি এসে হাসির রঙ্গমঞ্চে বাগড়াও দেয়। সুকুমার রায়ের রসরচনার স্রোত কাচের মতো স্বচ্ছ, তাতে সূর্যের আলো পড়ে নানা রঙ ঠিকরোয় এবং যে সব চলায়মান প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সে-গুলি যেমন অন্য লোকের ছায়াও হতে পারে, তেমনি দর্শকের নিজের ছায়াও হতে পারে। যারই ছায়া হক তারা দেখতে ভারি মজার। তাদের দেখে প্রচুর হাসিও পায়, আবার ভিতরে ভিতরে নিজের সম্বন্ধে খানিকটা অস্বস্তিও হয়।

সুকুমার রায়ের ছোটদের লেখক বলে খ্যাতি থাকলেও, তাঁর রচনাগুলি নিছক শুধু ছোটদের জন্য নয়। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে যে-সব ছোটদের বই সমঝদার বয়স্কদের সমর্থন পায় না, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর শিশুসাহিত্য নয়। ছোটদের ভালো বই বড়দেরো ভালো লাগা উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, এইখানেই তাদের আসল পরীক্ষা, সহানুভূতিশীল বড়রাও তাদের ভালো বলেন কিনা। ছোটদের অপরিণত বুদ্ধি সব সময় ভালোমন্দ যাচাই করতে পারে না; তাদের কাছে যেটা ভালো লাগে, আসলে সেইটেই সব চেয়ে ভালো, এমন কোনো কথা নেই। অনেক খেলো জিনিসও তাদের ভালো লাগে; তাদের রুচির কোনো মানদণ্ডই তৈরী হয় নি। তবে এ কথাও সত্যি যে বয়স্ক সমালোচকরা হাজার প্রশংসা করলেও, যে বই ছোটদের আনন্দ দিতে পারে না, রসের সভায় তাকে

পাস নম্বর দেওয়া যায় না। এই দিক দিয়েও সুকুমার রায়ের রচনা-সম্ভারকে বিচার করতে হয়।

ঠাকুমার ঝুলির গল্পগুলির আদি রচয়িতা যে কে বা কারা, এ কথা আজ আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গল্পগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, এই যথেষ্ট। রচনা যখনি দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি বলে স্বীকৃত হয়, তখনি তার পরম শুভ মুহূর্ত এসেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেক সময়ই দেখা যায়, ঠিক সেই সঙ্গেই রচয়িতার নামটি লোকে ভুলে যেতে বসেছে বা নাম জানলেও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল শুধু দু-চারজন জিজ্ঞাসু পাঠক ছাড়া, বিশেষ কারো নেই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায় সকলের ভাগ্যেই এই প্রায়-বিস্মৃতি লেখা ছিল। এখনো তাঁদের বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরুলে, ছেলেবুড়ো অবাক বিস্ময়ে পড়ে, কিন্তু মানুষগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, অথচ বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদানের মূল্য কতখানি সে কথা চিন্তা করবার এই হল সময়।

বাণীর বীণায় যারা নতুন সুর চড়াতে পারে, সাহিত্যের সভায় তাদেরি আসন সব চাইতে উঁচুতে। সুকুমার রায় বাংলার রসসাহিত্যে যে নতুন সুর বেঁধে দিয়েছিলেন, তাতে হাসির মর্যাদা গাম্ভীর্যের মর্যাদার সমান হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এই নতুন সুরের মর্ম সবাই নেবেও না, মানবেও না। সুকুমারের নিজের একটি নাটক থেকে এই কথাগুলি উদ্ধৃত :—

'এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরো-পুরি, কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না!)
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে!
(কাঁঠাল পাবে না;)

একটি একটি কথায় যেন সত্ত দাগা কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান!
(সাবান পাবে না)

কি রকম মানুষ ছিলেন সুকুমার রায়? যে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ স্ফুরণের আগেই ছত্রিশ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালে পরলোকে চলে গেলেন, তাঁকে জানত শুনত এমন লোকই বা ক'জন বাকি আছে?

দুই

প্রতিভা কারো ঘরে তিন পুরুষ ধরে বাঁধা রয়েছে, এমন বড় একটা শোনা যায় না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর আর তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তৃতীয় পুরুষে সেই বলিষ্ঠ প্রতিভার ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সুকুমার রায়দের বেলা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

ময়মনসিংহের মসূয়াগ্রামের এই রায় পরিবার সর্বদাই গতানুগতিকের চেয়ে একটু আলাদা বলে খ্যাত ছিল। এঁদের শারীরিক শক্তি, বিদ্যানুরাগ, বাক্যরচনা ও সঙ্গীতে পারদর্শিতার সকলে প্রশংসা করত। সেই সঙ্গে ছিল গভীর ধর্মভাব ও সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্য। সুকুমারের প্রপিতামহ লোকনাথের একদিকে যেমন গণিত শাস্ত্রে ও জরিপের কাজে অসামান্য দক্ষতা ছিল, অন্যদিকে ছিল তন্ত্রসাধনায় প্রবল অনুরাগ। পাছে তিনি সংসারত্যাগী হন, এই ভয়ে বাপ মা তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। তাতে কোনো ফল হল না দেখে শেষে একদিন তাঁর তন্ত্রসাধনার উপাদানগুলিকে তাঁরা বাড়ির পাশেই ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন। ক্ষোভে দুঃখে লোকনাথ সেই যে

শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। একটি শিশুপুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তার নাম কালীনাথ, সবাই তাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকত।

শ্যামসুন্দর বড় হলে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ও নানান ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে লোকে অবাক হত। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সিতে এমন সুপণ্ডিত কম দেখা যেত। শোনা যায় এই তিনের মধ্যে যে কোনো ভাষার রচনা সামনে রেখে, অন্য দুই ভাষায় এমন গড় গড় অনুবাদ করে যেতেন যে শ্রোতারা বিশ্বাসই করতে পারত না যে তিনি মূল রচনা থেকে পড়ছেন না, মুখে মুখে তর্জমা করছেন। লোকে তাঁকে শ্যামসুন্দর মুন্সি বলত। বেশি দিন বাঁচেন নি তিনি।

শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে হরিকিশোর রায় চৌধুরী নামক একজন একটু দূর সম্পর্কের কাকা দত্তক নিয়েছিলেন। এখন থেকে তাঁর নাম হল উপেন্দ্রকিশোর। অসাধারণ এবং বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। এক দিকে যেমন শিল্পে ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অন্য দিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অসামান্য।

ছবি আঁকা শিখবার জন্য কলকাতায় এসে বাস করবার সময় তখনকার সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর পরিচিত হন এবং পরে ব্রাহ্ম হন ও সমাজসেবক তেজী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর হাফটোন ব্লক প্রিন্টিংএর নতুন প্রণালী ইউরোপের বিশেষজ্ঞরাও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকাতে তাঁর নামোল্লেখ আছে। তা ছাড়া কবিতা, গান, গল্প রচনা, তাঁর মতো কম লোকে পারত। অপূর্ব বেহালা বাজাতেন, বাজাতে বাজাতে বহির্জগৎকে ভুলে যেতেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার শিশুসাহিত্যের নতুন যুগ প্রবর্তন করে দিলেন। তাঁদের

বইয়ের যেমন লেখা, তেমনি ছবি আর তেমনি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে তাঁরা বাংলা শিশুসাহিত্যকে যে পরিণতি ও সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন, তার ফলে আজ পর্যন্ত তার উচ্চ মান ক্ষুণ্ণ হয় নি। দুঃখের বিষয়, সে উচ্চ মান আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করে নি।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন সুকুমার রায়; সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ। চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য সত্যজিতের জগৎজোড়া খ্যাতি আছে তো বটেই, তার উপরে ছোটদের জন্য গল্প-রচনাতেও তিনি সুদক্ষ। ১৯৬৭ সালের বাংলা শিশুসাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তাঁর সুযোগ্য হাতে অর্পিত হয়েছে। বইয়ের নাম প্রফেসর শঙ্কুর ডায়ারি। বিজ্ঞানভিত্তিক্ কল্পনার সৃষ্টি, উদ্ভট অদ্ভুত। এই তিন পুরুষের প্রতিভা; তার মধ্যে সুকুমারই সম্ভবতঃ সব চাইতে বলিষ্ঠ শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু কাজ শেষ করে যাবার সময় পান নি। কেবলমাত্র প্রথম বই আবোল-তাবোলের ডামি কপিটি ছাড়া, নিজের কোনো রচনাকেই বই হয়ে বেরুতে দেখে যান নি।

তিন

১৮৮৭ সালে, ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে লাহাদের বিশাল বাড়ির দোতলার একটি ঘরে সুকুমারের জন্ম হয়। ঐ বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; দু-চারটি করে ঘর ভাড়া নিয়ে তখনকার কয়েকটি সাহসী ও স্বাধীনচেতা পরিবার সেখানে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন; রাস্তার ওপারেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ। উৎসবাদিতে অনেক সময় এ বাড়ির লম্বা ছাদে সারি সারি পাত পড়ত।

তাছাড়া এই বাড়ির নিচের তলায় বিখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা

শিক্ষালয়ের ক্লাস চলত। ছোট একটি বোর্ডিংও ছিল। বিকেলবেলায় সব ছেলেমেয়েরা ছাদে গিয়ে খেলা করত। বলা বাহুল্য সুকুমারের ও তার ভাইবোনদের ঐ স্কুলেই অক্ষর পরিচয় হয়েছিল এবং ঐ ছাদেই খেলাধুলো চলত। সুকুমারের বড় বোন বাংলা দেশের সব ছেলে-মেয়েদের চেনা। তাঁর নাম সুখলতা রাও। তাঁর লেখা দেশী ও বিদেশী রূপকথা, মধুর কবিতা ও গান যে পড়েছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। তার উপর চমৎকার তেল ও জল রঙের ছবিও আঁকতেন। ছোটবেলায় অমন শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে খুব বেশি দেখা যেত না। দিদি শান্ত লক্ষ্মী হলে কি হবে, সুকুমারকে কেউ অতটা বলতে পারত না। মাঝে মাঝে বিকেলে ছাদে উঠে বড়রা দেখতেন একজন কোঁকড়া চুল মোটাসোটা মিষ্টিমুখো শ্যামল ছেলে ঢিলে কুর্তা আর পাজামা পরে ডাণ্ডা হাতে মেয়েদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেটির ডাকনাম 'তাতা'; তার ছোট দিদিটিরো একটা ডাকনাম ছিল 'হাসি', কিন্তু সে সর্বদা এত গম্ভীর মুখ করে থাকত যে শেষ পর্যন্ত ও নাম সবাই ভুলেই গেল। বলা বাহুল্য উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকে ছেলে-মেয়েদের ঐ নামকরণ হয়েছিল।

তেরো নম্বরের বাড়িটা ছোট ছেলেমেয়ে দিয়ে ঠাসা ছিল। সারাদিন পড়াশুনা, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলো, সিঁড়ি দিয়ে কেবলি দুপ্ দুপ্ করে ওঠানামা লেগেই ছিল। তার উপর সুকুমারদের পরিবারটিও নেহাৎ ছোট ছিল না। সুকুমারের পরেই খুসি বলে একটি দুরন্ত বোন। তার ভালো নাম পুণ্যলতা; অনেক পরে 'ছেলেবেলার দিনগুলি' নাম দিয়ে একটি বই লিখে তিনি তাঁদের শৈশবটিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। খুসির পর মণি; শান্ত সুদর্শন রসময় সুবিনয় রায়, যিনি গান গাওয়ায়, অভিনয় করায় ছোটদের জন্য গল্প ও প্রবন্ধ লেখায় ওস্তাদ ছিলেন; কিন্তু যাঁকে দাদার বলিষ্ঠতর প্রতিভা আড়াল করে রাখত, যতদিন না এক দুঃখের দুপুরে সেই দাদা চিরকালের মতো বিদায় নিলেন। তাছাড়া নানকু

আর টুনি বলে ছোট ভাইবোন ছিল, তারাও ভালো কবিতা লিখত, গল্প লিখত। নানকুর আসল নাম সুবিমল, তাঁর লেখা উদ্ভট কল্পনার কাহিনীর জুড়ি হয় না। তিন ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই এখনো জীবিত আছেন।

এ ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি বারোমাস আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় অতিথি অভ্যাগত নিয়ে গমগম করত। তারা থাকা খাওয়ায় ভাগ বসাত, ভিড় বাড়াত। এই পরিবেশে ছেলেমেয়েগুলোর লোভী ও স্বার্থপর হবার উপায়ই ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বহু বছর পরের একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যার মধ্যে দিয়ে সুকুমারের ভিতরকার মানুষটাকে একটু চেনা যায়। তখন উপেন্দ্রকিশোর ইহলোকে নেই, সুকুমারের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। রোজ সকালে বুড়ো মাস্টার মশাই ওঁদের বাড়িতে এসে চা টোস্ট খেয়ে যান। বুড়ো হয়েছেন, সব দিকে আর খেয়াল থাকে না। চায়ের টেবিল অপরিষ্কার করেন, মুখ থেকে খাবার ফেলেন, সিক্নি মোছেন ; অন্য সকলে তাতে খুবই বিরক্ত হন। শেষ পর্যন্ত একদিন মাস্টার মশাইয়ের জন্য আলাদা একটা ছোট টেবিলের বন্দোবস্ত হল। একতলায় চা খেতে এসে, নতুন ব্যবস্থা দেখে, সুকুমার এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে, তখুনি ঘুরে আবার দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বলতেই, বললেন, 'বেশ, তাহলে কাল থেকে ঐ ছোট টেবিলেই আমাকেও চা দিও।' বলা বাহুল্য ছোট টেবিল তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এঁদের আত্মীয়স্বজনও নিতান্ত কম ছিলেন না, আলাদা বাড়িতে বাস করলেও, উপেন্দ্রকিশোরের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের গুণে সবাই তাঁকে ঘিরে থাকতেন। ঐ তেরো নম্বরের তিনতলায় সুকুমারদের দাদা-মশাই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী থাকতেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। ভারতের প্রথম

মহিলা গ্র্যাজুয়েট, তার উপর প্রথম পাস করা মহিলা ডাক্তার। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গিয়ে ডিগ্রি এনেছিলেন ; সেকালের লোকে মেয়েদের এমন কৃতিত্বের কথা ভাবতেও পারত না। যদিও পাস করেছিলেন, তবু তাঁকে এখানে ডিগ্রি দেওয়া হয় নি মহিলা বলে।

কাদম্বিনী ছিলেন সুন্দরী ও সুগৃহিণী এবং বয়সে প্রায় সুকুমারের মায়ের সমান সমান বলে, সুকুমারদের মামা-মাসিরা তাদের খেলার সাথী ছিল। এই উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক পরিবারটির প্রভাবে, সকলের মনেই একটা কুসংস্কার-মুক্ত স্বাধীনতার হাওয়া বইত। মেয়েরা স্কুলে ও পরে কলেজে পড়ত, অনেকখানি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত।

উপেন্দ্রকিশোরের চারটি ভাই-ই গুণী ছিলেন। পারিবারিক দোষ-গুণগুলি বংশে বংশে কি আশ্চর্যভাবে বর্তায়, এই পরিবারটিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সবার বড় সারদারঞ্জন বহুদিন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁকে লোকে বাংলা ক্রিকেটের জনক বলত ; একাধারে তিনি গণিত ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন ; তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক আজো আদর পায়। তাঁর খেলার সরঞ্জামের দোকান ও বইয়ের দোকান বিখ্যাত ছিল।

সারদারঞ্জন বিশ্বাস করতেন যে শুধু পড়ার ক্লাসে মানুষ তৈরি হয় না। মানুষ তৈরির কাজ খেলার মাঠেও চলে, নইলে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। খেলার মাঠে তাঁর দাড়ি-বিশিষ্ট লম্বা-চওড়া চেহারা-খানি প্রায় একটা অনুষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর বজ্র-কণ্ঠের হাঁক কম ছাত্রের অপরিচিত ছিল। তখনকার টাউন ক্লাব পত্তন ও তিন পুরুষ ছাত্রদের শরীর মন একসঙ্গে গঠিত করার কৃতিত্ব বড় কম নয়। গুরুগম্ভীর মাস্টার মশাই যে কত উৎসাহী খেলোয়াড় তাই দেখে সবাই আশ্চর্য হত।

বাকি তিন ভাইও খেলায় দক্ষ ছিলেন। গণিতের অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন ও পরে তাঁরি তিন ছেলে শৈলজা, হৈমজা ও সম্প্রতি

পরলোকগত নীরজা, সবাই সারদারঞ্জনের হাতে গড়া। চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন যেমন ভালো ক্রিকেট খেলতেন, তেমনি ভালো ছোটদের বই লিখতেন। কনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জনও নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন এবং জরিপবিভাগে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী 'বনের খবর' লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বলা বাহুল্য খেলার আলোচনায় ওঁদের বাড়ি মুখরিত ছিল। দল বেঁধে খেলা দেখা হত। মাছ ধরাতেও ভারি উৎসাহ ছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ভগ্নীপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু শুধু যে ব্যবসার-ক্ষেত্রে কুন্তলীন তেল ও দেলখোসের প্রস্তুতকারক বলে বিখ্যাত ছিলেন তা নয়, গানবাজনায় তাঁর ভারি উৎসাহ। তখনকার দিনে গ্রামোফোন বা রেকর্ড তৈরি সম্বন্ধে এদেশে কেউ-কিছু জানতেন না, কিন্তু হেমেন্দ্রমোহন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের রেকর্ড করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ সিলিণ্ড্রিকেল রেকর্ড বাজাবার যন্ত্র এখন সহজে পাওয়া যায় না।

এই রকম উদার পরিবেশে মানুষ হতে পেরেছিলেন, সুকুমারের সেটি পরম সৌভাগ্য। আর শুধু সুকুমার কেন, ও বাড়ির সংস্পর্শে যারাই এসেছিল তাদের কপাল ভালো। তবে সুকুমার যে অন্যান্য আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো নয় সে কথা তার শৈশবেই বোঝা যেত। ওদের বাবার একটা জন্তু-জানোয়ারের সচিত্র বই ছিল, সুকুমার সেই ছবি দেখিয়ে ভাইবোনদের আশ্চর্য সব গল্প বলত। তাছাড়া অনেক মনগড়া গল্পও বলত। তার কথায় কথায় লোকজনে ঠাসা ঐ বিশাল বাড়িটা রহস্যে ভরপুর একটা আশ্চর্য জায়গায় পরিণত হত। ভবন্দোলা বলে একটা জানোয়ারের কথা বলত, খুব মোটা, হেলেদুলে থপথপ করে হাঁটে। মস্ত পাইনের নাকি খুব সরু লম্বা গলা, সেটাকে পেঁচিয়ে গিঁট পাকিয়ে রাখে। অন্ধকার বারান্দার কোণে দেয়ালের পেরেকে গোল মুখ ভ্যাবা চোখ কোম্পুকে নাকি ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে পরবর্তী কালের অনেক রচনার

পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এর আরেকটি অব্যবহিত ফল হয়েছিল রাত্রে ছেলেমেয়েরা কেউ একা উঠতে রাজী হত না। কি জানি কোম্পু যদি থাকে।

ছোটদের জন্য লেখা কোনো মজার কবিতা পেলেই সুকুমার তাকে মুখস্থ করে ছোটদের শেখাত। এমনি মুখস্থ বলা নয়, ভাব দিয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি। ভালো অভিনেতা ছিল সে। অদ্ভুত মুখভঙ্গীও করত, হাসিমুখ কান্নামুখ রাগমুখ ভয়মুখ ন্যাকামুখ বোকামুখ। যা বই পেত, তখুনি পড়ে ফেলত, প্রথমে 'সখা' আর 'সাথী', তারপর দুই মিলে 'সখাসাথী', তারপর 'মুকুল'। এই মুকুলেই আট নয় বছর বয়সে সুকুমারের নিজের প্রথম কবিতা বেরিয়েছিল। একটির নাম 'নদী' আর একটির নাম 'টিকটিকটক'।

বাড়িতে সমস্তক্ষণ ছোটদের বই সম্বন্ধে বাপ কাকা ও তাদের বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা, শুধু ছোটদের জন্য গান গল্প কবিতা প্রবন্ধ রচনা করার বিষয়ে আলোচনা নয়; সে তো হল কাজের প্রথম অর্ধেকটুকু। লেখা হয়ে গেলে তাকে ছাপাতে হয়; ছবি এঁকে বা সংগ্রহ করে তার ব্লক তৈরি করতে হয়; তারপর ছাপতে হয়, রং দিয়ে ছাপতে পারলে তো কথাই নেই। ওঁদের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের খুব ঘনিষ্ঠতা; যোগীনবাবু সিটিস্কুলে মাস্টারি করেন; ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের গণ্ডী পার হয়েই সুকুমারও সেইখানে পড়ত। উপেন্দ্রকিশোরের আগেই যোগীনবাবুর ছোটদের জন্য বই বেরিয়েছিল। ছোটদের বই ছাপানোর অনেক সমস্যা; ছবি দিতেই হবে কিন্তু দাম বেশি করলে কেউ কিনবে না, আবার দাম খুব কমালে ব্লক করার খরচ উঠবে না; প্রকাশকরা ছাপবেন কেন? শেষ অবধি যোগীনবাবু নিজের প্রকাশনী ও ছাপাখানা করলেন, তার নাম সিটি বুক সোসাইটি। সেখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোটদের রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত' বেরুল।

ছবিছাপা নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নিজেও অনেক পড়াশুনো

করেছিলেন, বিলেত থেকে বই ও যন্ত্রপাতি এনে অনেক পরীক্ষাও করেছিলেন।

জ্ঞানচক্ষু ফুটে অবধি সুকুমার এই সব দেখে আসছে; লেখা, পড়া, ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, বই আকারে লেখা প্রকাশিত করা, এরি মাঝে সে যে নিজের জীবনের কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে তাতে আর বিচিত্র কি?

নিটোল সুন্দর শৈশব। বাবার সঙ্গে কলকাতা এবং আশেপাশের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা; যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ছবির প্রদর্শনী, স্বদেশী মেলা, কোনো কিছু বাদ নেই। যেখানেই যাওয়া হয়, বাবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব বুঝিয়ে দেন। অন্য দর্শকরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আকাশের রহস্য বোঝান বাবা, মস্ত টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের পাহাড় দেখান, সৃষ্টিরহস্যের কথা বলেন। ভবিষ্যতে যে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করবে, তার জ্ঞানের বনেদ পাকা হওয়া চাই। যুক্তির ব্যবহার যে জানে, কার্য-কারণের সম্বন্ধ বোঝে, কেবল মাত্র সে-ই আজগুবি রচনা করে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে।

চার

ছুটিতে মাঝে মাঝে দেশে যাওয়া হত; দেশ মানেই তো পূর্ব বাংলার মৈমনসিংহ জেলা; গান-গল্পের দেশ, 'মহুয়া' 'চন্দ্রাবতী'র পালা গেয়ে সেখানে গাইয়েরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত; কিছুদিন আগেও সেখানে পাড়ার মাঝখানে বাঘ দেখা যেত, সেই বাঘের গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা কাঁথামুড়ি দিয়ে রাতে ঘুমোত; রস-রোমাঞ্চের এমন জায়গা আর কোথায় আছে?

দেশে যাওয়ার পর্বটিও ছিল রোমাঞ্চকর; প্রথমে রেলগাড়ি, তারপর নৌকো, তারপর হাতি চেপে। নিজেদের দুটো হাতি ছিল;

একটার নাম যাত্রামঙ্গল, তার মেজাজ হঠাৎ হঠাৎ বিগড়ে যেত ; অন্যটা শান্তশিষ্ট, তার নাম কুসুমকলি ; তাদের খাওয়ার বহর দেখে সুকুমাররা স্তম্ভিত ! কলকাতার পর এ একটি অন্য রাজ্য ; চারদিকে ছায়ায় ঘেরা ফুলফলের বাগান, বাঁশঝাড় ; বড় বড় পুকুর। মানুষগুলো সাদাসিধে, সাজগোজের বালাই নেই, কিন্তু এক পয়সায় কত মাটির হাঁড়িকুড়ি জন্তুজানোয়ার নাকে ফুটো পুতুল ; কত চিনির তৈরি হাতি ঘোড়া রথ ; কত তিলের নাড়ু ক্ষীরের ছাঁচ। বেতগাছ থেকে বেতগোটা পেড়ে তেল নুন লঙ্কা দিয়ে ঝাকিয়ে কত খাওয়া ! ঘরবাড়িও অন্যরকম ; মাঝখানে একটা দোতলা পাকাবাড়ি ও পূজোর দালান, তার চারপাশে মাটির ঘর, উঠোন পেরিয়ে একটা থেকে আর একটাতে যেতে হয়।

দেশে আবার নানারকম ভয়, গোসাপ, হুতুমপ্যাঁচা। একদিন পুকুরপাড়ে রঙ-মাখা ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে দেখা ; তাকে দেখে বোনেরা ভয়ে জুজু ; সুকুমার তাদের পিছনে ঠেলে দিয়ে হিংস্র লোকটার পথ আগলে দাঁড়াল। সে হাত জোড় করে বলল তার কাজই হল বাবুদের বাড়ির পাঁঠা কাটা।

এখানে ওখানে চেঞ্জে যাওয়া হত, গিরিডি, মধুপুর, পচম্বা, চুণার, পুরী, দার্জিলিং। যেখানেই যাওয়া হয় বাবা তার ছবি এঁকে আনেন। আস্তে আস্তে সুকুমারের চোখও চারিদিক নজর করে দেখতে শিখল, ছবি আঁকার শখ তৈরি হল।

কাকারাও অনেক সময় সঙ্গে যেতেন, তাঁদের বয়স কম, বেড়ানোটা জমতো ভালো। ছেলেমেয়েরা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরতে চায় না, ছোটকাকার কথা শোনে না, তাই তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরেই যখন সন্ধ্যা নামল, ছেলে-মেয়েরা কাকাকেও পায় না, বাড়ি ফেরার পথও পায় না, হতাশ হয়ে প্রায় বসেই পড়ছিল এমন সময় গাছের আড়াল থেকে ছোটকাকার 'কু-উ' !

আরেকবার মধুপুরে ডিমওয়ালার কাছে কেনা অন্য ডিমের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ডিম পাওয়া গেল, প্রকাণ্ড বড়, সরু লম্বা। বড়রা বললেন ফেলে দে, সাপের না কুমীরের না কিসের ডিম কে জানে? কিন্তু ধনকাকা সেটাকে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ভেজে খেয়ে বললেন, 'যারই ডিম হোক, খেতে খাসা!' এঁরাই সুকুমারের নিত্যসঙ্গী।

উপেন্দ্রকিশোরের মনের ইচ্ছা ক্রমে বাস্তবে পরিণত হতে চলল, নিজে ব্লক করে ছবি ছাপবেন। বিলেত থেকে মস্ত মস্ত প্যাকিং বাক্স করে যে সব যন্ত্রপাতি, বই ও সরঞ্জাম এল, তেরো নম্বরে তার জায়গা কুলোল না। ওঁরা এতদিনের আস্তানা ছেড়ে শিবনারায়ণ দাস লেনে নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন, স্টুডিও হল, ছোট একটা প্রেস্ বসল, হাফটোন ব্লকের ছবি ছাপা শুরু হল। আর সেই সঙ্গে ব্লক নিয়ে অনলস গবেষণা। তাছাড়া হল ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো করার জন্য আলাদা ঘর; তেরো নম্বরের স্কুলের কুমুদিনীমাসিমার বদলে এলেন নতুন মাস্টার মশাই!

সুকুমারও ততদিনে আরো বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, স্কুলে পড়াশুনায় ভালো ছেলে বলে নাম হয়েছে, বন্ধুবান্ধবের তার অন্ত নেই। যেখানেই যায় আমোদের একটা ঢেউ তুলে চলে। বাড়ির মাস্টার মশাই কড়া মানুষ, চোখ পাকিয়ে বললেন, 'খবরদার মাটিতে কোনো জিনিস ফেলে রাখবে না, সব তুলে ডেস্কে ভরবে।' মাস্টার মশাই চলে গেলেই টপ করে মাটিতে বসা ছোট বোন টুনিকে তুলে সুকুমার ডেস্কে ভরে ফেলল; টুনির সে কি চীৎকার। কত রকম নতুন খেলা তাতার মাথা থেকে বেরুত। একটা খেলা হল 'রাগ বানানো', হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু করা যাচ্ছে না, কিংবা হয় তো সত্যি রাগ হয় নি, তবে হলেও হতে পারত, এমন ক্ষেত্রে রাগ বানাতে হয়। অর্থাৎ ভেবে নিতে হয় সে লোকটা কেমন কেমন অবস্থায় পড়লে সেও বেদম জব্দ হয় আর যারা খেলছে, তাদেরো ভারি মজা লাগে। এই খেলার সব চেয়ে মজা হল যে

খেলতে খেলতে কাল্পনিক ভাবে সে লোকটাও খুব জব্দ হয়, আবার তার উপর থেকে সমস্ত সত্যিকার রাগ একেবারে চলে যায়।

বোঝাই যাচ্ছে বাড়ির ছেলেমেয়েরা দেখতে দেখতে তাতার কেমন ভক্ত হয়ে উঠেছিল। একবার কে যেন মেয়েদের তিনটি চারাগাছ দিয়েছিল; তারা সেগুলিকে মাটির টবে পুঁতে, রোজ নিজের হাতে জল দিয়ে, খুব যত্ন করে বড় করতে লাগল। তারপর একদিন সুরমামাসির আর সুখলতার আর খুসির গাছে কুঁড়ি ধরল, কি আনন্দ সকলের! কিন্তু কুঁড়ি যখন ফুটল, তখন দেখা গেল সুরমামাসির আর সুখলতার গাছে কি সুন্দর নীলফুল, খুসির গাছের ফুল একেবারে সাদা। খুসির চোখে জল এল, সবাই মিলে সান্ত্বনা দিল, কেন সাদা ফুল মন্দ কি? পরদিন সকালে খুসি উঠে দেখে তার গাছেও কত রঙের কি চমৎকার সব ফুল ফুটে রয়েছে, তখন আর তাকে পায় কে! অনেক পরে গাছের গোড়ায় রঙের ফোঁটা দেখে বোঝা গেল, তাতাই রাতারাতি ফুলের উপর রঙ দিয়েছে! সকলের এত মজা লাগল যে খুসির দুঃখ একেবারে দূর হয়ে গেল।

বাড়িতে বড়রা অনেকে আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী। নবদ্বীপচন্দ্র দাশ বলে আরেকজন আসতেন, পারিবারিক উপাসনায় তিনি আচার্য হতেন। আরো অনেকে আসতেন, জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইত্যাদি। সকলের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের পরিচয় হল। মাঝে মাঝে বেশ রগড়ও হত; তাতার মুখে সদাই চটপট কথা; একবার এক হাঁড়ি সন্দেশ দেখিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, বললেন—এই এত সন্দেশ কে একলা খেতে পারে? কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু তাতা টপ করে বলল—'আমি পারি।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু অনেকদিন ধরে।' শুনে শাস্ত্রী মশাই খুব হাসলেন, 'ইতি গজ' নাকি? নবদ্বীপ বাবুকে বড়রা মামা বলতেন, কাজেই ছেলে-মেয়েদের তিনি দাদামশাই, ঠাট্টার সম্বন্ধ। মোটা মানুষ, বন্ধুরা তাঁকে 'জালা' বলে ডাকেন।

তাঁর জন্য খাবার জায়গা হয়েছে, পিঁড়ি পাতা হয়েছে, তাতা ছুটে গিয়ে তার উপরে একটা বিঁড়ে বসিয়ে দিল। বিঁড়ে ছাড়া জালা সোজা থাকবে কি করে?

সুকুমারের একটা গাম্ভীর্যের দিকও বরাবরই ছিল, যতই বড় হতে লাগল, ওর চরিত্রের মধ্যে একটা বলিষ্ঠতাও প্রকাশ পেতে লাগল। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ সে সইতে পারত না। একবার একজন গুরুজনকে ছোট শিশিতে বড় মাগুর মাছ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাতে দেখে সুকুমার প্রবল আপত্তি করে এবং তাই নিয়ে বাড়িতে খানিকটা অশান্তিও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গুরুজনটি সুকুমারের কথাই শুনেছিলেন।

বাইরের প্রভাব গ্রহণ করবার জন্য নিজের চিত্তকে সে সর্বদা উন্মুক্ত রাখত। তখন নতুন চলচ্চিত্র হয়েছে, অবিশ্যি নির্বাক ছবি, তারো অনেক বিরোধী। সুকুমারদের একজন শিক্ষক বায়োস্কোপের নিন্দা করাতে, সে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল যে সব ছবি তো মন্দ হয় না, ভালো ছবিও হয়। এক রকম জোর করেই তাঁকে 'লে মিজেরাবল' দেখিয়ে ছাত্র শিক্ষক মহাশয়ের মত বদলিয়ে দিয়েছিল।

মনের জোর ক্রমে আরো প্রকট হল। কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজে শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে অপমানকর উল্লেখ প্রকাশিত হওয়ায়, সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে পরের সংখ্যায় মন্তব্যটি প্রত্যাহার করতে সুকুমার তাঁকে বাধ্য করেছিল। তার দাদামশাই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও অনেক দিন আগে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে দ্বারিকবাবুর তখন বয়স বেশি ছিল, গায়ের জোরও বেশি ছিল, তিনি কাগজের টুকরোটিকে গুলি পাকিয়ে সম্পাদক মহাশয়কে সেটি জল দিয়ে গিলিয়ে ছিলেন, যাকে বলে 'made him eat his words'। এসব ছোট ঘটনা থেকে অনেক সময় স্পষ্ট বোঝা যায় পারিবারিক প্রভাব মানুষের চরিত্রগঠনে কতখানি কাজ করে।

সুকুমার মুখে মুখে মজার মজার ছড়া বানিয়ে ফেলত, তার

খাতাপত্রের পাতায় পাতায় মজার মজার ছবি আঁকা থাকত, বইয়ের ছাপা ছবিতে যত্ন করে রঙ দেওয়া হত। ফটোগ্রাফির শখ তো অনেক দিন থেকেই ছিল ; ক্রমে তাকে পাড়ার বে-সরকারি ফটোগ্রাফার বলা চলত।

ততদিনে শিবনারায়ণ দাশ লেনের ছোট বাড়ি ছেড়ে, উপেন্দ্রকিশোর ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে উঠে এসেছেন। ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানির পত্তন হয়েছে। একতলায় প্রেস বসেছে, দোতলায় তিন তলায় থাকা হয়। পরিবারের লোকসংখ্যাও বেড়েছে। ধনকাকা কুলদারঞ্জনের স্ত্রী বিয়োগের পর তিনটি মাতৃহীন ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনিও এই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যতদিন ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স এঁদের হাতে ছিল, তার জন্য হাসিমুখে অনলস ভাবে তিনিও পরিশ্রম করেছিলেন। এই ২২ নম্বরের বাড়িটি পাড়ার ছেলেদের একটা মহা কৌতূহলের ও আকর্ষণের জায়গা ছিল, এখান থেকে চমৎকার রঙ্গীন ছবি সংগ্রহ করা যেত। বাড়ির ছেলেমেয়েদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল।

পাঁচ

১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছিলেন; তাঁকে সাক্ষাৎ কাছে না পেলেও তাঁর কথা পারিবারিক কিংবদন্তী হয়েছিল। কাদম্বিনীর প্রভাবও দেখা যেত। কিন্তু ক্রমে উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ স্বকীয়তা দেখা যেতে লাগল। এই বয়স থেকেই সুকুমারকে অনেক লোকে চিনত ; বিলিতী কাগজ আসত বাড়িতে, 'বয়জ ওন পেপার' ইত্যাদি, তাতে ছবির প্রতিযোগিতা থাকত, ফটো তোলা, হাতে আঁকা সব রকম ছবি। সুকুমার তাতে যোগদান করে অনেকবার পুরস্কার পেয়েছিল।

সিটি স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস্ সি পড়তে লাগল। উপেন্দ্রকিশোর ততদিনে সাফল্যের শিখরে উঠেছেন, ছোটদের জন্য অনেকগুলি বই রচনা করে, নিজে সুন্দর ছবি এঁকে, নিজের উদ্ভাবিত নতুন প্রণালীতে নিখুঁতভাবে ছেপে দেশের ছেলেবুড়োকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর এই নতুন প্রণালীটি ছিল ইউরোপে প্রচলিত হাফটোন ব্লক প্রিন্টিংএর উন্নত সংস্করণ। বিলেতের পেন্‌রোজ অ্যানুয়েলে তার যথেষ্ট প্রশংসা বেরিয়েছিল এবং সব চেয়ে আশার কথা ১৯১১ সালে বিলেতে গিয়ে সুকুমার তার বাবার উদ্ভাবিত প্রণালীর প্রচলন দেখে কত খুশি হয়েছিল।

এর মধ্যে অনেকগুলি বইও লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, তার মধ্যে কবিতায় ছোট্ট রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই ইত্যাদি তুলনা হয় না। নাটক লেখারো শখ ছিল; 'মুকুলে' কেনারাম ও বেচারাম বলে তাঁর একটা হাসির নাটক প্রকাশিত হল। বাড়িতে কার জন্মদিনে ছেলে-মেয়েরা সবাই মিলে সেটিকে অভিনয় করল। তাদের উৎসাহ দেখে কে, পুরোনো কাপড় কেটে ড্রেস হচ্ছে সীন হচ্ছে; মা আবার তাই দেখে দাড়ি গোঁফ পরচুলা কেনার পয়সা দিলেন। চমৎকার নাটক হল।

বাড়িতে নিজেদের কেনা দাড়ি গোঁফ নিয়ে সবাই মহাখুশি। তার মধ্যে একটা দাড়ি ছিল খুব লম্বা, সেইটে পরে সুকুমার বেঁটে বামুন সেজে সবাইকে হাসাত। একদিন সেইটে পরে গণকঠাকুর সেজে এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে সুকুমার উপস্থিত হল। তাকে দেখবামাত্র বন্ধুর মা ঢিপ করে এক প্রণাম! সুকুমার পালাবার পথ পায় না!

একটা যেন নতুন পথ খুলে গেল; ভালো নাটক পেলেই তার অভিনয় করতে হবে। বাড়ির লোকরা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব

সবাই যোগ দেয়। সুকুমারই শেখায়, নিজেও অভিনয় করে, বোকা হাঁদার পার্ট সে সব চেয়ে পছন্দ করে। তারপর শুরু হল নাটক লেখা। প্রথম হাসির নাটক হল "রামধন বধ" অর্থাৎ অহঙ্কারী র‍্যামস্‌ডেন সাহেব কি করে জব্দ হল। সে এক ভারি মজার ব্যাপার। এখন থেকে সুকুমারের নিজস্ব ধারায় একের পর এক নাটক বেরুতে লাগল ; ঝালা-পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি।

উৎসাহীর দল সর্বদা তাকে ঘিরে থাকত, বাইরের লোক, যারা শুধু কৌতূহল মেটাতে এসেছে এমন কেউ এর মধ্যে ছিল না ; আস্তে আস্তে আপনা থেকেই একটা ছোট দল গড়ে উঠল। ক্লাবের নাম হল ননসেন্স ক্লাব ; ক্লাব হলে তার একটা মুখপত্রও চাই। মুখপত্রের নাম হল সাড়ে বত্রিশ-ভাজা। সেকালের একটা জনপ্রিয় খাদ্যর নামে নাম, সেই খাদ্যে বত্রিশ রকম উপকরণ লাগত আর সবার উপরে থাকত আধখানা শুকনো লঙ্কা ভাজা! হাতে লেখা কাগজ, তাতে অনেক মজার কথা, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি, বেশির ভাগই সুকুমারের নিজের হাতে লেখা বা আঁকা। মাঝে মাঝে গম্ভীর বিষয়েরো অবতারণা হত। 'পঞ্চ-তিক্ত পাঁচন' নামক সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু বড়রাও মন দিয়ে পড়তেন।

বহুকাল পরে সুকুমারের মেজো বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী, অর্থাৎ খুসি, তাঁর অননুকরণীয় 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে লিখছেন, 'নন্সেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝানো যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক্‌আপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথায় সুরে ভাবে ভঙ্গীতে তাদের অভিনয়ের বাহাদুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত আর প্রধান পার্টটা সাধারণতঃ সে নিজেই নিত। প্রধান মানে সব চেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট। হঁাদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না। অন্য অভিনেতাদের মধ্যেও অনেকেরি

হাসাবার ক্ষমতা খুব ছিল। অভিনয় করতে ওরা নিজেরা যেমন আমোদ পেত, তেমনি সবাইকে আমোদে মাতিয়ে তুলত।……… ছোটবড় সকলেই সমানে সে আনন্দ উপভোগ করত। নন্সেন্স ক্লাবের অভিনয় দেখার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকত।'

আস্তে আস্তে সুকুমারের অদ্বিতীয় চরিত্র দানা বাঁধছিল। নানান দিক থেকে কলেজের ছাত্র সুকুমারের চিত্রটিকে ফুটে উঠতে দেখা যেত। কৈশোরের বন্ধু বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ১৯৬৬ সালে তত্ত্ব-কৌমুদীতে লিখছেন, সুকুমারের শুধু একটা দিকই এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি; তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে যে দলটি তাঁর পাশে গড়ে উঠেছিল তারি অভিজ্ঞতার একটু অভিব্যক্তি এটুকু। "এসো আমরা একটা দল পাকাই।" বলে সুকুমার কোনোদিন তাঁর দল গড়ে তোলেন নি। তাঁর দল গড়ে উঠেছিল অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে, যেমন করে জলাশয়ের মধ্যকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে।………তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অপূর্ব। তার স্নিগ্ধ শান্ত উদার চোখ দুটির মধ্যে একটা সম্মোহিনী শক্তি ছিল।……এ ছিল প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ।'

দলের আসর ছিল পথে পথে, এর বাড়িতে ওর বাড়িতে। সত্যি কথা বলতে কি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের পাশের গলিটি ছিল আড্ডা দেবার পক্ষে পরম উপযুক্ত স্থান। সেখানে কারো রকে হয়তো দলের আলোচনা চক্র বসল; যারা জায়গা পেল না, তারা দাঁড়িয়ে রইল। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, সব বিষয়ে তর্কাতর্কি হত; মাঝে মাঝে উত্তেজনার চোটে চ্যাচামেচিও হত। প্রবীণ গৃহবাসীরা বিরক্ত হতেন। তাঁদের মধ্যে একজন হয়তো বললেন, 'ওদের কাঁধে চেপেই যখন যেতে হবে, করুক গে চ্যাঁচামেচি।' কিন্তু শোনা যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতৃদেব নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাড়ির সামনের রকটুকুকে মিস্ত্রী ডাকিয়ে কাটিয়ে ফেলেছিলেন।

দলের ছেলেদের অধিকাংশই উৎসাহী উৎসুক উদারচেতা ও সমাজ-সেবায় সুদক্ষ। তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রেরা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ও গুরুচরণ মহলানবিশদের বাড়ির ছেলেরা আরো অনেকে ছিলেন। যতই সুকুমার বড় হতে লাগল তার চরিত্রের দৃঢ়তা আরো প্রকট হয়ে উঠল; বন্ধুবর্গের স্বাভাবিক নেতা ছিল সে। হাসিখুশির অন্তরালে একটা স্থির বুদ্ধি কাজ করত। ব্রাহ্মসমাজের এই ছেলেগুলিকে ঠিকভাবে চালাতে পারলে দেশের অনেক কাজ হতে পারে এই বিশ্বাস নিয়ে ব্রাহ্ম যুবসমিতির পত্তন হল। সপ্তাহে একদিন সকলে মিলে আলোচনা, মাসে একবার এখানে ওখানে চড়িভাতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বিশাল বাগানবাড়িতে কিম্বা বালিতে মথুর গাঙ্গুলীর ছেলে সুধাংশু গাঙ্গুলীর বাড়িতে। গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্ন-ভোজন, গানবাজনা, আলোচনা।

১৯১০ সালে সমিতির মাসিক পত্রিকা 'আলোক' প্রকাশিত হল; ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে ছাপা তার প্রথম সংখ্যাটি নিলাম হল; দশ টাকা দিয়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক ছেলে সেটি কিনে নিল। ভারি সুনাম হল পত্রিকার, সুকুমারের অনেক রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছয়

কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে সুকুমার এখন বড়দের দলে ঢুকেছেন, যদিও বাড়িতে আগের মতোই অঙ্গভঙ্গী করে ভেংচি কেটে ভাইবোন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের হাসাতে ছাড়েন নি। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস্-সি পাস করলেন সুকুমার; তারপর গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ করে বিলেত যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সেখানে ফটো-গ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনলজিতে উচ্চতর শিক্ষালাভের আশা। সালটা

১৯১১ ; এই সময় আরেকজন বন্ধু জুটে গেল, তার নাম কালিদাস নাগ। পঁয়ত্রিশ বছর পরে কালিদাস নাগ লিখছেন,—

'রবীন্দ্রনাথের যখন ৫০ বছর বয়স তখন একবার আমরা থার্ড ক্লাসের টিকিট করে শান্তিনিকেতন যাই। পথে পরিচয় হয় সুকুমার রায়ের সঙ্গে। তিনি বিলেত যাবেন। তখনি দেখেছি সত্যকে ভেতর থেকে টেনে বের করে তার যে-রূপ দেখলে হাসি পায়, সেই রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্মগত অধিকার ছিল তাঁর। তাঁর প্রকাশক্ষমতা ছিল অসাধারণ।·····রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে তখন পয়সার টানাটানি। শালপাতায় নুন রেখে কাঁকরভরা চাল ডাল খেতে হত। তখন সুকুমার রায়ের হাসির হররা শোনা গিয়েছিল। খাচ্ছেন আর মুখে মুখে গান রচনা করছেন···রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে, এই তো ভালো লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়···

'সুকুমার রায় অভিনেতা এটা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। (ননসেন্স ক্লাবের খ্যাতি কালিদাস নাগের কানে তখনো পৌঁছয়নি নিশ্চয় !) একবার রবীন্দ্রনাথ জেদ ধরলেন গোড়ায় গলদ অভিনয় করতে হবে। অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন। সেই সঙ্গে সুকুমার রায়ের অপূর্ব অভিনয় দেখলাম। তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয়···ও আর সকলে মিলে বেসুরের ভূমিকা করেছিলেন। যত বেসুর হয় তত ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের মতো সুরজ্ঞের মধ্যে বেসুরের অভিনয় আশ্চর্য জিনিস।'

কালিদাস নাগের এই মন্তব্য পড়ে আরো মনে হয় যে আসলে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, রবীন্দ্রনাথের মতো সুরবানই বেসুরের রস দেখাতে পারেন ; সুকুমার রায়ের মতো যুক্তিবান বৈজ্ঞানিকই অসম্ভবের ছন্দ খুঁজে পান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই একটু একটু করে দেশাত্মবোধ দানা বাঁধছিল। যুবকবৃন্দের কারো পক্ষেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই যে তখনো আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয় নি, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর থেকে সকলের মনে অনেকখানি তিক্ততার গ্লানি জমেছিল। দেশটা যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিল; সুকুমারও একটি দেশপ্রেমের গান রচনা করেছিলেন, 'টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর' ইত্যাদি।

অনেকে দিশী জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এ বিষয়ে সুকুমারের মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় ভারি উৎসাহী ছিলেন; সারা কলকাতা চষে নানারকম দিশী জিনিস তিনি কিনে আনতেন, বাড়ি সুদ্ধ সকলে সেগুলি ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে সুকুমার একটা গান না বেঁধে পারলেন না। গানের নাম দিশী পাগলার দল।

'আমরা দিশী পাগলার দল,
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল' ইত্যাদি।

তারপর তখনকার দিশী জিনিসের চমৎকার বর্ণনা—

'দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি।
তা হোক না, তাতে দেশেরি মঙ্গল', ইত্যাদি।

একথা প্রায়ই শোনা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই হক, কিম্বা কাজের জন্যেই হক, যারা বিদেশে যায়, তারা একদিকে যেমন বিদেশের প্রভাব দেশে পৌঁছে দেয়, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেকেই যেন দূত সেজে দেশের কথা বিদেশে নিয়ে যায়। তাদের দেখে তাদের দেশকে বিদেশীরা বিচার করে। একথা এখন যতখানি সত্য, ছাপ্পান্ন বছর আগে আরো অনেক বেশি সত্য ছিল, কারণ তখন শুধু মুষ্টিমেয় বাছাই করা ছাত্র ও কর্মী বিদেশে যাবার সুযোগ পেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হেলায় ফেলায় সেখানে সময় না কাটিয়ে, নিজের পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও যতটা সম্ভব দেখে শিখে আসতেন। সুকুমারও তাই করেছিলেন।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে S. S. ARABIA জাহাজে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন এবং জাহাজ ছাড়ার প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে, ১৯১৩ সালে আবার দেশে ফেরা পর্যন্ত নিজের চোখকানকে সর্বদা সজাগ রেখেছিলেন। সেখান থেকে বাপ মা ভাইবোনকে

লেখা চিঠি পড়ে মনে হয় বিলেত যাওয়াটা তিনি যেমনি উপভোগ করেছিলেন, তেমনি উপকৃতও হয়েছিলেন। বাঙালী আবহাওয়াতে মানুষ, প্রথম প্রথম বিলিতী পোশাক পরতে, টাই বাঁধতে সময় নিত; জাহাজের ডাইনিং হল্-এ খেতে যেতে ইচ্ছা করত না। দেখতে দেখতে সে সব ভয় কেটে গেল।

তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল; ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিংএর কাজ হাতে কলমে ভালো করে শিখে, দেশে ফিরে সে বিদ্যাকে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের কাজে লাগাবেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাবার উদ্ভাবিত উন্নততর হাফটোনের কাজ ও-দেশের বিশেষজ্ঞদের সামনে হাতে-কলমে করে দেখাবেন। বলা বাহুল্য, উভয় আশাই সফল হয়েছিল।

পৌঁছেই লণ্ডনের স্কুল অফ ফটো এনগ্রেভিং অ্যাণ্ড লিথো-গ্রাফিতে ভরতি হয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। পড়ার ক্লাসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না; কারখানা লেবরেটরির ও স্টুডিওর কাজই বেশি, তাছাড়া বড় বড় ফ্যাক্টরি ও প্রদর্শনী দেখা। লিথোগ্রাফি ভালো করে শিখবার জন্য একজন দক্ষ শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা হল; এঁর কথা সুকুমার সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করতেন।

পরের বছর ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল অফ টেকনলজিতে বিশেষ ছাত্র হিসাবে ভরতি হয়েছিলেন। বড় প্রতিষ্ঠান, সেখানে ২০।২৫ জন ভারতীয় ছাত্রও কাজ শিখত। বহুতলা বাড়ি, ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট্ চলে সেখানে, তখন এসব জিনিস ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যেত না।

এ বিষয়ে ওদেশের শিক্ষক ও কর্মীদের যথেষ্ট প্রশংসা করা উচিত যে নতুন কিছু জানবার শিখবার তাঁদের অসীম আগ্রহ; এমন কি বাঙালী ছাত্রের কাছ থেকেও। সুকুমার মাকে লিখছেন, 'সামনের সপ্তাহে স্টুডিওতে বাবার multiple stop দিয়ে কি রকম করে কাজ করে তাই demonstrate করব, প্রিন্সিপ্যাল ও টীচাররা সব থাকবেন।' বাবাকে লিখছেন, 'Litho transfer আর halftone litho যত fine বা শক্ত হোক এখন হাতে নিতে ভরসা পাই।'

আরো লিখছেন 'সুবিধা হলে একটা কোনো বিষয়ে systematic research করবার ইচ্ছা আছে। মনে করেছি নানারকম dot এর দরুন ছবির gradation আর etching characteristics এর যে তফাৎ হয় সেইটা quantitatively দেখাতে পারলে মন্দ হয় না। তাছাড়া intaglia halftone block থেকে Woodbury typeএর মতো করে gelatine pigment দিয়ে ছাপবার একটা process কতকটা work out করেছি…।

ছাপাখানার কাজে নিজেকে নিবেদন করবার প্রস্তুতি এসব। বড় বড় কারখানা দেখতে যেতেন।

এই তো গেল কাজের কথা; অকাজের ক্ষেত্রেও সুকুমার কম উপকৃত হন নি। গিয়েই যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখতে শুরু করলেন, আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়ম, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস, কিউ গার্ডেন্স। অ্যালবার্ট হলে ক্রাইস্‌লারের বাজনা শুনছেন, আবার রঞ্জির ক্রিকেট খেলাও দেখতে যাচ্ছেন।

সাত

এই সময় রবীন্দ্রনাথও বিলেতে ছিলেন, তখনো নোবেল পুরস্কার পান নি, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওদেশে। তাঁর চারিদিকে একদল শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ জড়ো হয়েছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ তাঁদের সঙ্গে সুকুমারও পরিচিত হলেন। তাঁদের মধ্যে হ্যাভেল ও রোথেন্‌স্টাইনের মতো শিল্পীও ছিলেন, ব্রিজেস্ ও ইয়েটসের মতো কবিও ছিলেন; তাছাড়া ফক্স স্ট্র্যাংওয়েস্, সিলভান লেভি এবং পিয়ার্সনও ছিলেন। এঁরা পরে ভারতবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, কিন্তু যখন সুকুমারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, এদেশে এঁদের কেউ জানত না।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইত্যাদি অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গেও পুনর্মিলন হল, নতুন বন্ধুও জুটল। সে সময় স্যার কে জি গুপ্ত ও ডাক্তার পি কে রায় কার্যব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে বাস করছিলেন। ডাঃ পি কে রায়ের অনন্যসাধারণ পত্নী সরলা রায়ের বাড়িতে প্রতি রবিবার স্থানীয় বাঙ্গালীরা মিলিত হতেন। একসঙ্গে লুচি তরকারি খাওয়া, দেশ ও বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হত। সরলা রায় চিরকাল স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতেন। বিলেতে গিয়ে একজন করে ভারতীয় মেয়ে যাতে তিন চার বছর পড়াশুনা করতে পারে, সেইজন্য তিনি তখন টাকা তুলতে ব্যস্ত। ভিক্ষা করে টাকা নয়, ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় নিয়ে মূক অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ।

তার জন্য সকলকেও যেমন খাটাতেন, নিজেও তেমনি খাটতেন। সুকুমারকে ভার দিলেন হিন্দু দেবদেবীদের আকার আকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে। এইজন্য সুকুমারকে বেশ কিছুদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘাঁটতে হয়েছিল। প্রচুর টাকাও উঠেছিল।

এঁদের বাড়িতে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সাহিত্যানুরাগী লোকের অভাব ছিল না। পিয়ার্সন সাহেব একটু একটু বাংলা জানতেন, এদিকে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত; তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোটখাটো জমজমাট সাহিত্য সভা বসত। সুকুমারকে তিনি ধরে বসলেন রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে কিছু লিখে এনে পড়তে। সুকুমারের মনের মতো কাজ; প্রবন্ধ লেখা হল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ হল। তার মধ্যে ছিল 'পরশ পাথর,' 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে,' ইত্যাদি।

অকুস্থলে গিয়ে সুকুমার দেখেন সামনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বসে। দেখেই হাত-পা ঠাণ্ডা, তবু সাহস করে পড়ে দিলেন এবং উপস্থিত সকলেই অতিশয় প্রীত হলেন। এর ফলে সুকুমারের খ্যাতি বাড়ল।

East and West Societyতে ডাক পড়ল; তাঁদের আসরে 'The Spirit of Rabindranath প্রবন্ধ পড়তে হল; 'Quest' পত্রিকায় সেটি ছাপা হল। নানান্ জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

নোবেল পুরস্কার পাবার আগেও যে রবীন্দ্রনাথ বিলেতের লোকদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন, তার ছোটখাটো প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় Royal Court Theatre-এ ইংরেজীতে 'ডাকঘর' অভিনয় হল। মালিনী ও চিত্রাঙ্গদার মহড়া চলতে লাগল।

এসব ছাড়াও সাধারণ দৈনিক জীবনও মন্দ কাটত না। তখন ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, এই মেয়েদের সাফ্রাজেট্ বলত। তাঁরা দলে দলে পথে বেরিয়ে শোভাযাত্রা করতেন; ভালোভাবে উদ্দেশ্য সাধন করতে না পেরে, তাঁরা রুদ্ররূপ ধরলেন, পার্লামেণ্টের সামনে হট্টগোল ও ঢিল ছোঁড়া; বহু বড় দোকানের প্লেট গ্লাসের শো উইণ্ডো ভেঙ্গে, কারাবরণ করা ইত্যাদি। পুলিসের লোকদের আঁচড়ে-কামড়েও দিতেন মাঝে মাঝে। সুকুমার ছোট বোনকে লিখলেন—দেড়শো জন মেয়ে গিয়ে হ্যারড্স্-এর ফ্যাসানেব্ল্ দোকানের জানালা ভাঙ্গল, একশো গ্রেপ্তার হল, দলের পাণ্ডা বিখ্যাত হাসির গল্প রচয়িতা W. W. Jacobsএর স্ত্রী।

বয়সের তুলনায় সুকুমারের মানসিক বিবর্তন অনেকখানি এগিয়েছিল; তাই বলে বয়সোপযোগী তারুণ্যের মোটেই অভাব ছিল না। চিরকালই দোহারা চেহারা, অল্পেই গায়ে মাংস লাগে; বিলেত যাত্রার সময় ওজন ছিল চোদ্দ স্টোন; সেটাকে কমিয়ে প্রায় তেরো স্টোনে এনে একদিকে যেমন খুশি, অন্যদিকে একটু ক্ষোভের সঙ্গে বাড়িতে লিখছেন 'আর কমবে বলে মনে হয় না'।

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের অতুলনীয় মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হল। সুকুমার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় হয়

হাসির গল্প, নয় তো কবিতা লিখতেন ; সঙ্গে ছবি এঁকে দিতেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ভালো লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করতেন।

দেখতে দেখতে বিলেত বাসের মেয়াদ ফুরুল। সুকুমার F. R. P. S. উপাধি পেয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁর আগে কোনো ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেন নি। শেষ দুই মাস যেখানে যত ভালো ছাপার কাজ হয় নিজের চোখে সব দেখে, কন্টিনেণ্ট বেড়িয়ে, তবে সুকুমার আবার দেশে ফিরলেন। ভাবনা-চিন্তা নেই, মাথার উপরে অসাধারণ বাবা, সম্মুখে স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ।

আট

দেশে ফিরে সাগ্রহে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন সুকুমার। দুঃখের বিষয় এই সময় উপেন্দ্রকিশোরেরও মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করল। সুখের উপাদানের অভাব ছিল না তাঁর ; ১০০নং গড়পার রোডে নিজের সুন্দর বাড়ি হয়েছে ; তারো একতলায় প্রেস, দোতলার সামনের দিকে অফিস, বাকি অংশে বাস করা হয়। উপেন্দ্রকিশোরের মনটা নিশ্চয় সুখশান্তিতে ভরা ছিল। বড় ছেলে বিলেত থেকে কৃতিত্ব অর্জন করে এনেছে ; পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে এখন সে তাঁর ডান হাত। উপযুক্ত পাত্রী দেখে এবার তার বিবাহ দিলে উপেন্দ্র কিশোরের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পাত্রীর নাম সুপ্রভা, দীর্ঘাঙ্গী শ্যামা শিখরদশনা। মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল আর কোকিলের মত কণ্ঠ। ঢাকার খ্যাতনামা সমাজ-সেবক কালীনারায়ণ গুপ্তর দৌহিত্রী, সুকুমারের সঙ্গে বিলেতে আলাপ সেই স্যার কে জি গুপ্তের ভাগিনেয়ী। সুকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায় ; কি রকম মেয়ে তাঁর ভালো লাগে

জিজ্ঞাসা করাতে তিনি নাকি বলেছিলেন এমন মেয়ে যে গান গাইতে পারে আর যাকে রসের কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। সুপ্রভা ছিল ঠিক তেমনি মেয়ে। তাকে দেখেই সুকুমারের ভালো লেগেছিল; মাত্র দশ বছরের বিবাহিত জীবন তাঁদের সুখে ভরা ছিল।

শিল্পীর চোখ ও হাত ছিল সুপ্রভার, রসবোধ ছিল প্রচুর, কিন্তু মানুষটি ছিলেন গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ণা, অনলসভাবে কাজ করে যেতেন। পতিগৃহে এসে সবাইকে সুখী করেছিলেন। গম্ভীর মেয়েটিকে প্রথমে কেউ কেউ অহঙ্কারী ভেবেছিলেন, কিন্তু বছর না ঘুরতে তাঁরাও তার প্রীতির কণা লাভ করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন গান গাইতে পারতেন, তেমনি গৃহকর্মে সুনিপুণা। বড়বৌদির হাতের রান্না খেয়ে পুরুষরা যেমন তৃপ্ত হতেন, তাঁর কাছে রান্না শিখে মেয়েরা সবাই কৃতার্থ হয়ে যেতেন।

১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর পরলোক গমন করলেন। সুকুমার ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয়ের হাতে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের সমস্ত দায়িত্বের ভার পড়ল। সুকুমারের বয়স তখন মাত্র ২৮ বছর, সুবিনয় আরো বছর পাঁচেকের ছোট। দুবছরের বেশি বিলেতে বাস করেও সুকুমার সাহেব বনে যান নি; পোশাক-পরিচ্ছদ আগের মতোই সাদাসিধে; অভ্যাসগুলোও অনেকটা তাই; পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সেইরকম প্রীতির সম্বন্ধ; সমাজ পাড়ার গলিতে সেই তর্কাতর্কি।

তবে তফাৎ যে একেবারেই ছিল না তাও নয়। মাঝে মাঝে ছবির প্রুফ হাতে ছাপাখানার লোক সমাজ পাড়ার গলিতে উদয় হত; সুকুমার তখন আলোচনা ছেড়ে মনোযোগ দিয়ে প্রুফ দেখতেন। হয় তো প্রবাসী পত্রিকার জন্য ছবি; রামানন্দবাবুও ঐ পাড়ার বাসিন্দা, প্রুফ নিয়ে গেলেন সুকুমার তাঁকে একবার দেখিয়ে আনতে।

ব্রাহ্ম যুবক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা তিনি, ঘরে বসে যতই হাসিঠাট্টা চলুক, নিজেদের মধ্যে যতই মস্করা চলুক, বাইরের গাম্ভীর্য

রক্ষার দিকে সুকুমারের সদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার গ্রহণ করবে,—কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে, সুকুমারের পক্ষে এসব সমর্থন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বাইরের আচরণে কোনো লঘুতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বাংলাদেশের মেয়েরা সকলের সম্মানের যোগ্যা হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

কোনো গোঁড়ামি ছিল না সুকুমারের, উদার খোলা মন। সামাজিক জীবনেই হোক আর শিল্প বা সাহিত্য জগতেই হোক সুকুমারের মানস সর্বদা স্থির যুক্তিসংগত চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাঝে মাঝে তর্ক-বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়তেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি নিতান্ত অপটুও ছিলেন না, ছাত্রজীবনেই সমাজ পাড়ার গলিতে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। বিখ্যাত শিল্পজ্ঞ ও সি গাঙ্গুলীর সঙ্গে একবার প্রবাসীর পাতায় ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে এমনি বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় ধৈর্য হারিয়ে জোর করে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলী মহাশয়ও তখম নব্য যুবক ছিলেন।

ক্রমশঃ সুকুমারের চারদিকে অনেকগুলি গুণী-লোকের সমাগম হল ; তাঁদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিক, নিদেন সঙ্গীতে, শিল্পে ও সাহিত্যে অনুরাগী। দেখতে দেখতে মণ্ডে ক্লাব নামক রস-চক্রটি দানা বাঁধল। সভ্যরা এর বাড়িতে ওর বাড়িতে সমবেত হতেন। কখনো গানবাজনা, কখনো প্রবন্ধ, গল্প বা কাব্যপাঠ, কখনো দেশী কখনো বিদেশী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কখনো রসালাপ, কখনো অভিনয়, কখনো বা স্রেফ ক্লাবের মিটিং। এই সঙ্গে অবশ্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য থাকত।

এই মণ্ডে ক্লাব সম্পর্কে আরো কিছু বলা আবশ্যক, কারণ এরকম ক্লাবের কথা, অন্ততঃ এদেশে, আর কখনো শোনা যায় নি। অনেকের

মতে ক্লাবের আদি নাম ‘মণ্ডা ক্লাব’। খাওয়া দাওয়ার আতিশয্যের কথা ভেবে এই উৎপত্তি অসম্ভব বলে মনে হয় না।

১৯১৭-১৮ সালের ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী দেখে চমৎকৃত হতে হয়। সভ্য সংখ্যা পঁচিশ। তার মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আছেন কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, অতুলপ্রসাদ সেন, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র শর্মা, কিরণকুমার বসাক ইত্যাদি। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

মণ্ডে ক্লাবে অবিশ্যি কারো মুখ উজ্জ্বল করার কথা উঠত না; দরকার হলে সেক্রেটারী মশায়ের কাছে সকলকেই দাঁতখিঁচুনি খেতে হত। সেপ্টেম্বর ১৯১৭ থেকে আগস্ট ১৯১৮এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সাড়ে চল্লিশটি অধিবেশন হয়ে ছিল। ঐ ফালতু আধখানা অধিবেশন সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা গেল না।

আলোচিত বিষয়াদি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, আলোচ্য বিষয় জুট ইণ্ডাস্ট্রি, বিবেকানন্দ। তিন-চারবার আলোচ্য বিষয় বাংলা আঞ্চলিক ভাষা। এগুলি সম্ভবতঃ শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমারের দায় ছিল। তাছাড়া Strindberg, Turgenev, Plato ইত্যাদি, কেউ বাদ যান নি।

আয়-ব্যয়ের তালিকায় দেখা যাচ্ছে সুনীতিবাবুর প্রেমচাঁদ ভোজে সাড়ে ষোল টাকা খরচ হয়েছিল, তেমনি তিনি দানও করেছিলেন সতেরো টাকা!

এই ক্লাবের নিত্য চাহিদা মেটাতে সুকুমার প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক লিখতেন; অন্যান্যরাও কেউ কেউ যেমন করতেন। তাঁর এই সব প্রবন্ধ নাটক পরে সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

দিন চলে যেতে লাগল ; সুকুমারকে চেনে না বাংলাদেশের লিখতে পড়তে পারে এমন ছোট ছেলে বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। শারীরিক পরিশ্রমে বিরূপ এই হাসিখুশি মানুষটির সারাদিন কালি কলম রং তুলি ক্যামেরা ছাপাখানা নিয়েই কাটত। ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের অনেক দায়-দায়িত্ব। সুকুমার সুবিনয়ের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। যদি আরো কিছুদিন বাবার কাছে শিক্ষানবিশী করার সুযোগ পেতেন, তাহলে পরিণাম অন্যরূপ হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু এমনিতে দিনে দিনে ব্যবসায়ে নানান সমস্যা দেখা দিতে লাগল। নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটলেও, সুকুমারের হাসির স্রোত বন্ধ হল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিরকালই স্নেহ করতেন ; উপরন্তু সুপ্রভা সুগায়িকা, কবির কাছে তারো কদর কম নয়। মাঝে মাঝে ওঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসতেন। একবার সেখানে পূর্ববঙ্গ সম্মেলন হল ; সুকুমার ময়মনসিংহের ছেলে, তাকে সভাপতির আসনে শুধু যে বসিয়ে দেওয়া হল তা নয়, উপরন্তু বাঙাল ভাষায় ভাষণ দিতে বাধ্য করা হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা সীতা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ভাষণের বাঙাল ভাষা খুব সুবিধার হয় নি, বরং সুপ্রভাকে মঞ্চে বসালে কাজে দিত।

এইভাবে কাজে কর্মে আহ্লাদে আনন্দে, সুকুমারের দিন কেটে যেতে লাগল। ১৯২১ সালে তাঁর ঘরে সুন্দর একটি পুত্রের জন্ম হল। সেই ছেলের নাম সত্যজিৎ রায়। সেই বছরেই সুকুমার কঠিন রোগে পড়লেন। কালাজ্বরের তখনো ভালো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি, যদিও নানান পরীক্ষা চলছিল। ক্রমে সুকুমারের শরীর ভাঙতে শুরু করল। তবু তিনি বৃথা কালক্ষেপ করেন নি, অনলস তাঁর তুলি কলম আর যে এসেছে তার সঙ্গে দুটো রসিকতা। প্রথম বই বেরুচ্ছে 'আবোল-তাবোল', তার ছবি আঁকা, তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে তৈরি করা এই নিয়ে দিনগুলি ভার থাকে। ঐ বইয়ের dummy copyটি ছাড়া আর তৈরি বই দেখা হল না।

মনে মনে তিনি যাবার জন্য নিজেও প্রস্তুত, সুপ্রভাকেও দুঃখ বরণ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। জীবনমরণের রহস্যের পটভূমিকায় 'অতীতের ছবি' কাব্যে লেখা হল। সমস্ত পরিবারের উপর ধীরে ধীরে শোকের ছায়া নেমে আসতে লাগল। মণ্ডে ক্লাবের হাসিও চিরকালের মতো থেমে গেল।

আবোল-তাবোলের শেষের কবিতায় সুকুমার লিখেছিলেন,

"আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে·········
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের বালা সাঙ্গ মোর।"

২৩শে ভাদ্র ১৩৩০, সুকুমার বৃদ্ধা বিধবা হতভাগিনী মাকে, উনত্রিশ বছর বয়স্কা অনন্যসাধারণ স্ত্রীকে, দু'বছরের পুত্রকে আর সমস্ত বৃহৎ আত্মীয়কুল ও বন্ধুবান্ধবদের শোকাচ্ছন্ন করে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। দু বছর পরে ইউ রায় এ্যাণ্ড সন্সও উঠে গেল।

নয়

আগেই বলা হয়েছে সুকুমার রায় আবোল-তাবোলের ডামি কপি ছাড়া নিজের রচনার একটিকেও পুস্তকাকারে দেখে যাবার সময় পান নি। তাঁর প্রথম ও সম্ভবতঃ সব চাইতে জনপ্রিয় বই ঐ আবোল-তাবোলের অনেকগুলি ছবিই রোগশয্যায় বালিশে ভর করে আঁকা। ভিতরের ছবি আঁকা হল, মলাট আঁকা হল—এমন মলাট ভারতে কেউ কখনো আঁকে তো নি-ই, পৃথিবীতে কেউ এঁকেছে কিনা সন্দেহ। পাঠ্যাংশের প্রায় সবটুকুই দশ বছর ধরে সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে মাসের সন্দেশে সুকুমারের আবোল-তাবোল না থাকত, তরুণ পাঠক-পাঠিকারা মুখ ভার করত। আবোল-তাবোলের ছেচল্লিশটি কবিতার সম্ভবতঃ প্রথম ও শেষটি ছাড়া প্রত্যেকটিই আগে শিশু-জগতের সমর্থন পেয়ে, তারপর বই-এ স্থান পেয়েছে।

স্বচ্ছন্দে বলা চলে আবোল-তাবোলের জুড়ি নেই। অনেকে এর অনুকরণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কি ভাবে, কি ভাষায়, একটিও উৎরোয় নি। আবোল-তাবোলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে। তারপরে একে একে সুকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনের রচনাগুলির মধ্যে এক-আধটি ছাড়া প্রায় সবই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার তারিখের সঙ্গে প্রকাশনের তারিখের কোনো সম্বন্ধ নেই, সুবিধামতো সাজিয়ে বই-গুলিকে বের করা হয়েছিল; তাদের মধ্যে থেকে সুকুমারের অসাধারণ ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা তাই সম্ভব নয়। ছত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করলেও, একথা ভুললে চলবে না যে মাত্র আট বছর বয়স থেকে তাঁর লেখা শুরু হয় এবং আটাশ বছর ধরে তিনি ক্রমাগত লিখে গিয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ছোট শিশু থেকে তিনি পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন, সেই সঙ্গে

তাঁর প্রতিভার কুঁড়িটিও ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, পাপড়ি মেলে ফুলটি ফুটেছিল, কিন্তু ফল পাকার সময় ছিল না।

সুকুমারের রচনাবলীকে মোটামুটি বিষয় অনুসারে তিন ভাগ করা যায়, যথা—কাব্যরচনা, নাটক এবং গল্প ও প্রবন্ধ। এর মধ্যে সম্ভবতঃ কাব্যাংশই সব চাইতে পরিণতি লাভ করেছিল। শুরু থেকেই তার মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল যে কোনোটিকেই কাঁচা লেখা আখ্যা দেওয়া যেত না।

এখন পর্যন্ত তাঁর চারটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, আবোল-তাবোল, খাই-খাই, অতীতের ছবি ও বর্ণমালা তত্ত্ব। এগুলি কি ছোটদের বই, নাকি বড়দের বই, তাই নিয়ে প্রশ্ন।

এর উত্তর দিতে গেলে আবার সেই গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়, ছোটদের বই বড়দের বই বলে কোনো দুটি আলাদা বিভাগ হয় না; ছোটরা যে বইয়ের রস ও অর্থ গ্রহণ করতে পারে সে সব বই-ই ছোটদের বই আর বই মাত্রই বড়দের বই। তবে সন্দেশে প্রকাশিত রচনাগুলিকে সুকুমার নিশ্চয় ছোটদের উপযুক্ত বলেই বিবেচনা করেছিলেন এবং সেই সব কবিতাই আবোল-তাবোল ও খাই-খাইএ স্থান পেয়েছে।

সুকুমারের রচিত সাতটি নাটকের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, যথা অবাক-জলপান, ঝালা-পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হিংসুটি, ভাবুক-সভা, চলচিত্তচঞ্চরি ও শব্দকল্পদ্রুম। এর মধ্যে প্রথম চারটিকে ছোটদের উপযুক্ত বলা চলে।

সুকুমারের গল্প ও প্রবন্ধের তালিকার শুরুতেই হ-য-ব-র-ল'র নাম করতে হয়। এটিকে ছোটদের জন্য বড় গল্প বলা যায়। তাছাড়া আছে পাগলা দাশু ও বহুরূপী, দুটিই ছোটদের উপযুক্ত গল্পের সংগ্রহ। বর্ণমালাতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধমালা নানান বিষয়ে ও নানান সময়ে লিখিত। বিলেতে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধও আছে। এসব প্রবন্ধের তাৎপর্য ছোটরা বুঝবে না।

বাকি রইল প্রফেসর হেঁসোরামের ডায়রি, ডায়রি আকারে লেখা রসরচনা ; এটি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত না হলেও, ছোট বড় সকলেই সমান ভাবে উপভোগ করবে।

এসব ছাড়া সারাজীবন ধরে লেখা, অজস্র ছবি, কবিতা, প্রবন্ধাদি নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অনুসন্ধান করে সেগুলি সংগ্রহ করার কাজ কোনো অনুরাগী ও আগ্রহী গবেষকের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিলেত থেকে বাবা, মা, ভাই, বোন ও অন্য আত্মীয়দের লেখা চিঠিগুলি যেন সোনার খনি।

সুকুমারের চিন্তাধারাই গানের সুরে বইত। যেখানে যেতেন এমন একটি হাসির ও গানের স্রোত বইয়ে যেতেন যা দেখে অচেনা লোকে অবাক হয়ে যেতেন। আবার যখন সেই হাসির মানুষটি গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উপাসনার আসনে বসতেন, তাঁদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। আসল কথাই হল সুকুমার যা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন, গাম্ভীর্যের ভিত্তি না থাকলে আলো-হাওয়ায় ভরা হাসির প্রাসাদ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবে কি করে?

আবোল-তাবোলের শুরুতে গ্রন্থকার একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

"যাহা আজগুবী, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

সুখের বিষয় পাঠক যতই বিদ্বান বিচক্ষণ হোন না কেন, মনটা তাঁর খেয়াল রসের খোলা হাওয়াতে ছাড়া পাবার জন্য আঁকুপাঁকু করে, কাজেই খুব কম লোকই এ বইয়ের রসগ্রহণ করতে অসমর্থ। ছোটদের কথা তো বলবার নয় ; তাদের মনে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানের সূক্ষ্ম দেওয়াল তখনো ওঠে নি, কোনটা বাস্তব আর কোনটা খেয়াল তার কোনো বাছ-বিচার নেই, সমস্ত বিশ্ব তাদের কানে কানে কথা বলে, আবোল-তাবোল যে তাদের মনের মতো বই হবে সে আর বিচিত্র কি!

একদল লোক আছেন যাঁদের ধারণা ছোটদের বই মাত্রই

শিক্ষাপ্রদ হবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, পড়বামাত্র ছোটরা নতুন কিছু শিখে নেবে, কিম্বা কি করে ভালো ছেলে হতে হয় বুঝে নেবে। তাঁরা বলেন, এই শিখে নেওয়া ও বুঝে নেওয়াটা যদি আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। অর্থাৎ শিক্ষাটাই হল বড় কথা, রসের দরকার হয় শুধু পাঁচনটাকে গেলাবার জন্য। রসসৃষ্টি বা শিল্পসৃষ্টি কিন্তু এভাবে হয় না; সূর্যের আলো যেমন আপনার নিয়ম অনুসারেই চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথাই ওঠে না, তবু আলো লেগে গাছের পাতা শ্যামল হয়ে ওঠে, ফুলের পাপড়িতে রঙ ধরে; রসের সৃষ্টিও তেমনি সমস্ত জীবনকে উষ্ণ কোমল প্রাণময় বর্ণময় করে তোলে, নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, বিকশিত হয়ে ওঠাই তার ধর্ম বলে। সত্যকার কোনো শিল্পরচনার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু রূপকথার সোনার কাঠির মতো, যাতেই তার ছোঁয়া লাগে সেই সোনার হয়ে যায়।

এই রকম বই আবোল-তাবোল। শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য নয়; মনের তাগিদে রচয়িতা এ বই লিখেছিলেন, কেউ যদি পড়ে শিক্ষালাভ করে ভালো কথা; যদি নাও করে শুধু একটু আনন্দ, একটু আমোদ পায়, তাই যথেষ্ট। আর যে অভাজনরা তা-ও পান না, গোড়াতেই তো লেখা আছে, 'এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে'।

এ ধরনের রচনা—যার সঙ্গে হয়তো বাস্তব জগতের দৈনন্দিন চেহারার খানিকটা আদলও আসে, তফাৎও থাকে,—বাস্তব জগতের হতাশা ব্যর্থতাগুলোকে এরা অস্বীকার করে না, কিন্তু তার বাইরে একটা বৃহত্তর জগতে ডাক দিয়ে যায়, যেখানকার ঠিকানা জানা থাকলে দুঃখজ্বালাগুলোকে কিছুটা সইতে পারা যায়।

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয় রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।

আয় খ্যাপা মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন ধিন,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টি ছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয় রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে॥

দশ

'হিউমার'-এর ব্যাখ্যা অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত সাধারণতঃ অতিশয় নীরস ভাবেই দিয়েছেন; কেউ বলেছেন স্বাভাবিক নিয়মের অপ্রকাশিত ব্যতিক্রমেই হিউমারের সৃষ্টি; কেউ বা বলেছেন হাস্য-রসের প্রধান উপাদান হল অপ্রাসঙ্গিকতা, অর্থাৎ যেখানে যেটা থাকার কথা নয়, ঠিক সেইখানে তার অকারণ উপস্থিতি হল লোক হাসাবার মূল কারণ। হাসির কথা বিশ্লেষণ করলে সম্ভবতঃ এর সবই কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাই বলে শেষ কথাটি বলা হবে না। হাসির মধ্যে যে একটা বিলিয়ে দেবার বয়ে যাবার ভাব আছে, যার মধ্যে থেকে পৃথিবীর হতাশা ব্যর্থতাকে মেনে নেবার শক্তি পাওয়া যায়, তার কথা বড় কেউ বলেন না। তার উপরে হিউমারের মধ্যে একটা আত্মজ্ঞানের কথাও আছে, নিজের গর্ব খর্ব করে, তবে না প্রাণ খুলে হা-হা হো-হো করে হাসা যায়। এই কারণে শ্লেষাত্মক কবিতা বা satire-কে রসাত্মক বা humorous বলা যায় না।

সুকুমার লিখছেন,

'ভাবছি মনে হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ করে,
ভাবতে গিয়ে ফিক্‌ফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক করে।

পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিমটি কেটে, নাকের ভিতর নোখ গুঁজে।
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়।
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে ক খ গ আর শ্লেট দেখে,
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মত পেট থেকে।

আসল কথা আছে ঐ শেষের লাইনে; বস্তুজগৎ খুঁজে দেখলেও হাসির কারণ সবটা পাওয়া যাবে না; কেমন করে দেখতে হবে তাও জানা চাই নিজের মন থেকে। জানতে পারলে আর ভাবনা নেই, বাইরের পাঁচজনকেও জানিয়ে দিলেই হল। এমন কি যাঁরা হাসির শত্রু, হাসাকে যারা অকেজো লঘুতা বলে মনে করেন তাঁদেরো সদাই মনে ভয় ঐ বুঝি হেসে ফেললাম। হাসির মালমশলা বুকে নিয়ে তাঁরা এখন করে কি।

'যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে, মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাম্পে উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে!

বলতে গেলে আবোল-তাবোল বইখানি হাসির পাঁচালি ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র এই বইটির কবিতাগুলি সুকুমারের নিজের হাতে বাছাই করা। এর মধ্যে রোজকার অনুজ্জ্বল জীবনের এমন একটা হাসির বাখানি দেওয়া রয়েছে যা যেমনি আশাতীত, তেমনি

অপরূপ। প্রতিদিনের বিরক্তিকর জিনিসগুলিও যে এত মজার তাই বা কে জানত।

রাতদুপুরে বেড়ালের চ্যাচানিতে যাদের ঘুম ভাঙ্গে, তাদের মধ্যে ক'জনা তার মূল কারণটির খবর রাখে? হয়তো উনুনমুখো পাটকিলেকে ডেকে বলছে,

"চুপচাপ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো,
আয় ভাই গান গাই, আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার করে,
কোন গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে।
পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।"

শুধু বেড়ালরা কেন, মাঝরাতের হু হু-করা আধখানা চাঁদ আমরাও অনেকে দেখেছি। তাই দেখে বেড়ালদের মনে কি হল?

"চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকি!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক করে নিবে গেল বুকভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি,
বিলকুল সব দেখি ভেলকির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিমনির কালি!"

এই হতাশার পরে বেড়ালদের পক্ষে আর যা করা সম্ভব, তখন তারা তাই করে—

"মন ভাঙা দুখ্ মোর কণ্ঠেতে পুরে,
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।"

অসম্ভবের রাজ্যে কি ভাবে চলতে হয় এ কবিতা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রস-রহস্যের বা ফ্যাণ্টাসির গল্পের কারবারই হল লোকে যাকে অসম্ভব বলে তাই নিয়ে; যা কখনো হয়েছে বলে শোনা যায় নি তাই নিয়ে। কিন্তু এর পিছনে একটা আশার ইঙ্গিতও থাকে; যা আজ পর্যন্ত হয় নি, তা যে কোনো দিনও হবে না, তাই বা কে বলতে পারে। যা হয় না, শেষ পর্যন্ত তাই যদি এক শুভদিনে ঘটে বসে, তাহলে সে এলোমেলো যথেচ্ছভাবে ঘটবে না, তারো একটা নিজস্ব নিয়ম থাকবে, তাকেই কবি 'অসম্ভবের ছন্দ' বলেছেন। কুকুর বেড়ালরা হয়তো কথা বলতেও পারে, (যা তারা আজ অবধি করেছে বলে শোনা যায় নি,) কিন্তু কুকুরের কথা নিশ্চয় হবে কুকুরে ধরনে আর বেড়ালদের কথায় নিশ্চয় একটা বেড়ালেপনা থাকবে, যেমন এই কবিতায় আছে। পাশ্চাত্যেও এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাও এই সিদ্ধান্তেই পেঁ াছেছেন যে ফ্যাণ্টাসির ঘটনা impossible হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু convincing হওয়া চাই। যেমন এক্ষেত্রে সকলের মনে হওয়া চাই যে বেড়ালরা যদি সত্যি তাদের মনের কথা খুলে বলে, তা হলে নিশ্চয়ই এই ভাবেই বলবে। এই convince করার অর্থাৎ পাঠককে আশ্বস্ত করার গুণটি না থাকলে, কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে রস-রহস্য উপভোগ করা সম্ভব হত না। মরিস মেটারলিঙ্কে-র ব্লু বার্ডেও এই নিয়মের চমৎকারিত্ব দেখা যায়।

লোকে কেন হাসে, সেটি অবশ্য বলা কঠিন। বাইরের ঠিক সুরটির আঘাত লাগলে যেমন বাক্সের মধ্যে বেহালার বাঁধা তারে গুঞ্জন ওঠে, এমন কি অবস্থা বিশেষে ফট্ করে ছিঁড়ে যেতেও দেখা যায়—তেমনি বহির্জগতের কোনো দৃশ্য বা শব্দ বা নৈঃশব্দ্য মনের ঠিক অবস্থাটিতে ধরা পড়লে মানুষের অন্তর্জগতেও সাড়া জাগায়। তার ফলে সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে। মাঝে মাঝে মনের তারটি কারো হয়তো অন্য সুরে বাঁধা থাকে, কাজেই সবাই হাসলেও সে হাসে না;

কিম্বা আর সবাই গম্ভীর হয়ে থাকলেও, তার হাসি পায়। এটা কিছু হাসির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়, রসজগতের একটি প্রত্যক্ষ নিয়মমাত্র।

এভাবে দেখতে গেলে হাসির মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতার উপাদান আছে, যার সঙ্গে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের একত্র বাস সম্ভব নয়। তাই হাস্যরস আর ব্যঙ্গরস আলাদা জিনিস; হাসি মানুষকে কাছে টেনে নেয়, ব্যঙ্গের মধ্যে একটু নির্মমতা একটু বিদ্বেষ মেশানো থাকে, তা সে যত মজার কথাই হোক না কেন। হাসির মধ্যে দিয়ে যে হাসছে, যাকে নিয়ে হাসছে ও যে হাসাচ্ছে তারা পাশাপাশি এমন ঘেঁষে বসে যে আলাদা করে চেনা যায় না। যিনি ব্যঙ্গ করেন তিনি নিজেকে উঁচুতে আসন দিয়ে, হাসিকে অস্ত্র বানিয়ে পাত্রকে বিদ্রূপ করেন। অন্তরঙ্গতার জায়গায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়।

নির্মল হাসির নমুনা আছে 'নারদ নারদ' কবিতাটিতে, তার বিষয়-বস্তু হল বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করা; কিম্বা যাঁরা নিজেদের ভারি পণ্ডিত মনে করেন তাঁদের সম্বন্ধে 'বুঝিয়ে বলা' কবিতাটিতে।

এগারো

সুকুমারের প্রখর কল্পনা-শক্তি; রস জমাবার জন্য অদ্ভুত পরিস্থিতি পরিকল্পনায় তিনি অদ্বিতীয়। পটভূমিকা-রচনায় ছবিগুলির তুলনা হয় না; সুকুমারের আঁকা ছবিগুলিকে রচনা থেকে আলাদা করা যায় না; লেখা ও আঁকা দুটিতে মিলে তবে রস জমেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবি বাদ দিলে পদ্যেরও মানে থাকে না; যেমন 'চোর ধরা'র নায়ক বলছেন রোজ তাঁর টিপিন কে বা কাহারা খেয়ে যায় বলে আজ তিনি ক্ষেপে গিয়ে, ঢাল তলোয়ার হাতে খাড়া পাহারায় আছেন। যে-ই আসুক না কেন তার আর রক্ষে নেই!

এদিকে ছবিতে ত দেখা যাচ্ছে ঢাল তলোয়ার হাতে টাকমাথা দাড়িমুখো খাড়া পাহারায় আছে বটে কিন্তু তার পেছন দিকে রাজ্যের বেড়াল কাক ইত্যাদি থালার খাবারের সদ্ব্যবহার করছে!

আজগুবির নিয়ম হল পৃথিবীর কার্যকরী নিয়মের ঠিক উল্টো। সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে, সব চেয়ে সহজ উপায় অবলম্বন করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করাই হোল পৃথিবীর মানুষদের কাজ। আজগুবির নিয়ম অন্যপ্রকার। প্রথম কথা হল সেখানে উদ্দেশ্যের বালাই নেই, অন্ততঃ লাভের বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নেই। যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাও উদ্ভট রকমের, যেমন ছায়াবাজীর ধামাহাতে ঐ দাড়িমুখো বুড়োটা বলছে—

"ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি!
রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া হরেক রকম পুঁজি।

* * *

চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর, খাঁচায় রাখি পুরে।

* * *

কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে ইদিক উদিক চায়।
সেই সময় গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাৎলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।"

এখন এই সব ভালো ভালো ছায়া নিয়ে করা হবেটা কি? এত কষ্ট করে এদের সংগ্রহ করে শেষটা কি সব নষ্ট হবে? তা মোটেই নয়; বুড়ো এসব দিয়ে ওষুধ বানাবে—

"গাছগাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে!

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আজগুবির যে একেবারেই কোনো উদ্দেশ্য নেই তাও নয়। মহুয়াগাছের মিষ্টি ছায়া ব্লটিংপেপার দিয়ে শুষে যদি ওষুধ বানিয়ে, শিশিতে পুরে, চোদ্দ আনায় বিক্রি করা যেত কি ভালোটাই না হোত!

আজগুবির জগতের বাসিন্দারাও একটু অদ্ভুত—ট্যাঁশ গোরু, যদিও সে গোরু নয়, আসলে সে পাখি; খুঁৎখুঁতে জানোয়ার যাকে সব কিছু দিয়ে, মায় হাতির শুঁড়, ক্যাঙ্গারুর ঠ্যাং, গোসাপের ল্যাজ, পাখিদের ডানা, সব দিয়েও তবু খুশি করা গেল না; হুঁকোমুখো হ্যাংলা, দুটি মোটে ল্যাজ থাকাতেই যার কাল হয়েছে; এদের কাছে কি সাধারণ নিয়মকানুন খাটে কখনো? তাছাড়া সেসব দিয়ে হবেই বা কি? কবি বলছেন,

> "বেজার হয়ে যে যার মতো করছ সময় নষ্ট,
> হাঁটছ কত, খাটছ কত, পাচ্ছ কত কষ্ট!
> আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
> শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে ধিন্‌তা?
> পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দাও ঝেড়ে,
> 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম। দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

একজন ইংরেজ কবি লিখেছিলেন যে দেবতারা গাছের পাতার মর্মরধ্বনিতে, নদীর জলের কল-কল্লোলে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করেন, কবি তারি কিছু কিছু শুনতে পান।

> "And the poet who overhears
> Some random words they say
> Is the fated man of men,
> Whom the ages must obey."

সুকুমারও এই দলেরই fated man of men, যার কথা একবার শুনলে, লোকে সহজে ভুলতে পারে না। কারণ তার মধ্যে পার্থিব দুঃখ-হতাশার ফাঁকে ফাঁকে চিরন্তন হাসির সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ছোট্ট ছোট্ট ছড়া আছে সুকুমারের যেন একেকটি রত্ন। এমনিতেই তাঁর মুখে আপনা থেকেই যখন তখন ছড়া ফুটত ; জাহাজে চড়ে চড়িভাতি করতে যাওয়া হচ্ছে, ডেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, একে একে যেমন বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটছেন, অমনি ছড়া—

"মাঘোৎসবের স্টীমার পার্টি মস্ত মজার ব্যাপার,
জ্বোরো রুগী চলল ক্ষেপে:মাথায় বেঁধে র‍্যাপার।
খাবার দাবার নিয়ে সবাই উঠল না'য়ে চেপে,
মংলু এল শিং বাগিয়ে, জংলু গেল ক্ষেপে !"

খসড়া খাতায় মণ্ডে ক্লাবের সম্পাদকের হয়ে মিটিংএর নোটিশ লিখছেন। এখানে একটু বলে রাখা দরকার যে মণ্ডে ক্লাবের সম্পাদক মশাই কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতেই সভ্যের দল যা মন চায় করতে লাগলেন। তারপর যখন সেক্রেটারি ফিরে এসে মিটিং ডাকলেন, সুকুমার তাঁর হয়ে লিখলেন,

"আমি অর্থাৎ সেক্রেটারি
মাস তিনেক কলকাতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে,
অমনি কি সব গেছে ফেঁসে !
বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া !
চিন্তা নেইকো গভীর বিষয়,
আমার প্রাণে এসব কি সয় ?
এখন থেকে সমঝে রাখো, এ সমস্ত চলবে নাকো
আমি আবার এইছি ঘুরে, তান ধরেছি সাবেক সুরে
মঙ্গলবার আমার বাসায়, আর থেকো না ভোজের আশায়,
শুনবে এসো সুপ্রবন্ধ
গিরিজার বিবেকানন্দ !"

অন্য লোকের মুখে যেমন কথা ফোটে, সুকুমারের মুখে ছড়া

ফুটত তেমনি অবলীলাক্রমে। ছোট কবিতার দু'চারটি নমুনা দিই—

"আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে যত লোক সব কাজ ফেলে।
তাই দেখে খুঁৎধরা বুড়ো কয় চ'টে,
দেখছ কি, এ রং পাকা নয় মোটে!"

আরো আছে,

"কহ ভাই কহরে অ্যাঁকাচোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না?
লেখা আছে কাগজে, আলু খেলে মগজে
ঘিলু যায় ভেস্তে, বুদ্ধি গজায় না।"

কিম্বা,

"শুনেছ কি বলে গেছে সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?
টক টক থাকে নাকো যদি হয় বৃষ্টি,
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি!"

এসব শুনলে কার মন না ভালো হয়ে যায়?

পুনরায় সুকুমারের পরিস্থিতি পরিকল্পনার কথায় ফিরে আসা যাক। এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা যায় যে সাধারণতঃ হিউমারের মধ্যে যে অপ্রত্যাশিতের অংশ থাকে, সে-ই হয় পরিস্থিতি রচনার প্রধান অবলম্বন। বে-মানান ও বে-ফাঁস এর মূল উপাদান; অসামঞ্জস্য ও অ-প্রাসঙ্গিকতা এক্ষেত্রে কাম্যবস্তু।

এই অপ্রত্যাশিত গুণটি আবার দু'রকম হতে পারে; পাঠক বা দর্শকের অপ্রত্যাশিত, কিম্বা রচনার নায়কের অপ্রত্যাশিত। সার্কাসের পালোয়ান কোমর বেঁধে, জাহাজের কাছির মতো মোটা একটা দড়ি ধরে হেঁইও হেঁইও করে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনল কাকে—না, একটা

কুকুর বাচ্চাকে। দর্শকরা এই অ-প্রত্যাশিত আবির্ভাবে হেসে গড়াগড়ি। আবার এমনও হতে পারে যে অবস্থাটা দর্শকদের কাছে মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু নায়কের কাছে অপ্রত্যাশিত। যেমন ছোটবেলায় একবার খেলার প্রতিযোগিতায় দেখেছিলাম চোখ বাঁধা অবস্থায় obstacle race হচ্ছে। যারা যোগ দিচ্ছে, চোখ বাঁধার আগে তাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে, দৌড়ের পথের obstacle বা বাধাগুলোকে মুখস্থ করে নিতে বলা হল। হয়তো প্রথমে কয়েকটা বড় বড় কাচের বোতল, দশ পা পরেই এক উল্‌টোনো চেয়ার, তারপর বালিশের স্তূপ, তারপর একটা ক্যানেস্তারা—এইরকম। সবাই দেখে স্থির করে নিল কোনটা কি ভাবে ডিঙোতে হবে। তারপর যেই না চোখ বাঁধা হয়ে গেল, অমনি পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা নিঃশব্দে বাধাবিঘ্নগুলোকে সরিয়ে নিয়ে, পথ খোলসা করে দিল। কিন্তু প্রতিযোগীদের কাছে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কাজেই তারা খোলা পথ পেয়েও শূন্যে মহালম্ফঝম্প করতে লাগল। দর্শকদের হাসতে হাসতে চোখে জল! রস-সাহিত্যেও অপ্রত্যাশিতের এই দুই প্রয়োগ দেখা যায়।

আবোল-তাবোলের 'চোর ধরা'র জবরদস্ত নায়ক যেমন অপ্রত্যাশিত পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না; কিম্বা 'কি মুস্কিল' কবিতার নায়কের হাতের কেতাবে দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য লেখা থাকা সত্ত্বেও, অপ্রত্যাশিত ষাঁড়ের আগমনের ক্ষেত্রে কোনো বিধান নেই—"সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দাকেতা,
পূজা-পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখছে হেতা।
সব লিখেছে কেবল দেখা পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়
পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।"

তখন ষাঁড়ের দূরত্ব কিন্তু তিন হাত পশ্চাতে। ছবি থেকে সেটা প্রকট হচ্ছে।

এ ধরনের প্রয়োগে কবি আগে থাকতেই পাঠককে মজার

ব্যাপারটা জানিয়ে দেন, বিশেষতঃ নায়ককে জানাবার আগে। আবার উল্টোটিও দেখা যায়, যেখানে কবিতার পরিণাম পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত বলেই রস জমেছে। 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। রাজাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না, গরম জামা এঁটে, ঠা-ঠা রোদে, তেতে ওঠা ইটের গাদায় বসে স্লেট আঁকড়ে ঘেমে নেয়ে উঠছেন, তবু প্রশ্নের কোনো উত্তর পাচ্ছেন না। "লেখা আছে পুঁতির পাতে, নেড়া যায় বেলতলাতে, নাহি কোনো সন্ধ তাতে, কিন্তু প্রশ্ন কবার যায় ?" রাজার বুদ্ধির বহর দেখে পাঠক একরকম মনে করে আছেন। এমন সময় রোগা এক ভিস্তিওলা টিপ করে বাড়িয়ে গলা রাজার পায়ে প্রণাম করে,

"হেসে বলে—আজ্ঞে সে কি ? এতে আর গোল হবে কি ?
নেড়াকে তো নিত্য দেখি আপন চোখে পরিষ্কার।
আমাদের বেলতলা সে, নেড়া সেথায় খেলতে আসে,
হরে দরে হয় তো মাসে নিদেনপক্ষে পঁচিশ বার !"

এই অপ্রত্যাশিত সমাধান পাঠক মুচকি হেসে পকেটস্থ না করেই বা করেন কি ?

বারো

আরেকটা কবিতায় ভালো জিনিসের ফর্দ আছে।

"দাদাগো দেখছি ভেবে অনেক দূর
এ দুনিয়ায় সকল ভালো।
আসল ভালো নকল ভালো
সস্তা ভালো দামীও ভালো
তুমিও ভালো আমিও ভালো

* * *

ঠেলার গাড়ি ঠেলতে ভালো

খাস্তা লুচি বেলতে ভালো
গিটকিরি গান শুনতে ভালো
শিমুল তুলো ধুনতে ভালো,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভালো
কিন্তু সবার চাইতে ভালো
—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড় !"

শেষ লাইনটা পড়ে পাঠক তো অবাক্ !

নিছক যা আজগুবী, সে চিরকালই আমাদের অনভ্যস্ত ও অপ্রত্যাশিত, কি লেখাতে, কি ছবিতে। বোম্বাগড়ের রাজা যে ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা বাঁধিয়ে রাখে, তার মানেটা কি ? সিংহাসনে শিশি বোতলই বা ঝোলায় কেন, তাও আস্ত শিশি নয় ? রাজার পিসি নেহাৎ ক্রিকেটই যদি খেলেন তো কুমড়ো দিয়ে কেন ? তারপর কুমড়ো পটাসের কথাই ধরা যাক। সে নাচল কি কাঁদল, কি হাসল কি ছুটল কি ডাকল, তাতে আমাদের কি ? তবে কি এ কথাই সত্যি যে রসের রাজ্যে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অচল ?

সাধারণ বুদ্ধি অচল বলে ছেড়ে দিলেই হল না। আসলে এসব কবিতা আমাদের প্রতিদিনকার চেনা জগতের মুখের উপর একটা রোমাঞ্চময় অচেনার মুখোশ এঁটে দেয় ; যা সচরাচর কিম্বা কোনো-কালেই হয় না, তার সম্ভাবনায় মনটাকে খুশি করে তোলে।

এতই খুশি করে দেয় যে আবোল-তাবোলের অনেক কথা, অনেক চরিত্র আজ প্রবাদবাক্যের মতো মুখে মুখে ফেরে। বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরোলেই ফুরিয়ে যায়। তা আর যাবে না, আর কোথায় লেখা আছে ভূতের মা ভূতের ছানাকে কি বলে আদর করে !

"বলছে আবার—আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকোরে,
ছ্যাখ্না ফিরে প্যাখ্না ধরে হুতোমহাসি মুখ করে !
ওরে আমার বাঁদর নাচন আদর গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল ওরে আমার হোঁৎকারে !

ওরে আমার গোবরা গণেশ ময়দাঠাসা নাদুসরে,
ছিচ্‌কাঁদুনে ফোকলা মাণিক ফের যদি তুই কাঁদিস্ রে!
এই না বলে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট করে,
কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি, মিলিয়ে গেল চট্ করে!"

পাঠকের মন খুশি হয়ে ওঠে, এমন চমৎকার যোগাযোগ, এমন খাসা ভূতুড়ে সামঞ্জস্য আর কোথায় আছে?

আবোল-তাবোলের জন্য সুকুমার তাঁর হাসির কবিতাই বেছে দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর গাম্ভীর্যের দিকটাও যে কবিতায় প্রকাশ পেত তাতে আর আশ্চর্য কি? 'খাই-খাই' বইখানিতে হাল্কা সুরে লেখা অনেকগুলি গম্ভীর ভাবের কবিতা স্থান পেয়েছে। এসব কবিতার মধ্যেও কিন্তু মাস্টার মশাই সেজে শিক্ষা দেবার কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা নেই, শিক্ষা যদি থাকে সেটা পরোক্ষ ভাবেই আছে। তার বদলে বরং কেবলি মনে হয় রঙ্গমঞ্চের পিছনে যে একটা হাল্কা পর্দা ঝুলছে, দমকা বাতাস লেগে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি সেটা উড়ে যায়, অমনি প্রকাশ পাবে তার পিছনে ভারি মজার এক রাজ্য। এমনিতেই পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে ওদিককার আলো দেখা যাচ্ছে, কানে আসছে একটা অস্ফুট হাসির গুঞ্জন। অভাবনীয়ের যেন এটা পূর্বাভাস, ইংরেজীতে যাকে একটা suggestive quality বলে।

'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই'য়ের মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ। শখের বোটে বাবু মশাই চলেছেন, মাঝিটা একেবারে আকাট মুখ্যু, চাঁদ কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে কিছুই জানে না। বাবু বলেন—'জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!' নদী কি করে নেমে আসে, সাগরের জলে নুন কেন, তাও ব্যাটা কিছু জানে না। বাবু বলেন—'জীবনটা তোর নেহাত খেলো, আট আনাই ফাঁকি।' আকাশ কেন নীল, চাঁদে সূর্যে গ্রহণ লাগে কেন, এসব বিষয়ে লোকটার কোনো ধারণাই নেই! বাবু বলেন, 'দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।'

এমন সময় ঝড় উঠল, নৌকো দুলল—

"মাঝি শুধায়—সাঁতার জানো ?—মাথা নাড়েন বাবু।
মূর্খ মাঝি বলে—মশাই, এখন কেন কাবু ?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কর পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে !"

বর্ণমালাতত্ত্বের শুরুতে ঐ যে কথাগুলি সুকুমার লিখেছিলেন :—

"পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া এ দীন দুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।"

ঐ কথা ঘুরেফিরে তাঁর মনে গুঞ্জন করত। নিয়মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা না থাকলে নিয়ম-হারা হিসাবহীনের কারবার করা সম্ভব নয় এ কথা আগেও বলা হয়েছে। খাই-খাইয়েও সেই একই চিন্তা ; 'বর্ষ আসে বর্ষ যায়' কবিতাটিতে পৃথিবীর বিষয়ে কবি বলছেন,

"না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে।
না জানি কোন ঘূর্ণিপাকে দিনের পর দিন,
এমন করে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরাম হীন।
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষ যুগের প্রথা,
না জানি তার চালচলনের হিসাব রাখে কোথা !"

'এ কেমন কারবার'-এ আছে,

"কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে !
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস-ঋতু—এ কেমন কারবার !"

সেই অদৃশ্য কারবারির হাতে পরম নিশ্চিন্তে দুনিয়াকে ও নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কবি বলছেন,

"মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,

তালবেতাল খেয়াল সুরে,
তান ধরেছে কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশার ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে ;
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন,
চমকে জাগে ক্ষণে ক্ষণ।"

মনের খুঁটি যার শক্ত করে গাড়া আছে, আজগুবীর দেশের পাগলা ঘোড়ায় চাপতে তার ভয়টা কিসের ?

ছত্রিশ বছরের জীবনের শেষ দুটি বছর রোগশয্যায় কেটেছিল সুকুমারের ; মনে মনে বুঝেছিলেন তাঁর দিন ফুরিয়েছে, যাবার জন্য নিজেকে তাই প্রস্তুত করেছিলেন। এই সময়ের রচনা "অতীতের ছবি"তে তাঁর হৃদয়ের যে গোপন বিশ্বাস চিরকাল তাঁর কলমে বল জুগিয়েছিল, তার দেখা পাওয়া যায়। কবিতা আরম্ভ হচ্ছে,

"অজর অমর অরূপ রূপ,
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ।
দেহ নহে মোর চির নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।"

অকাল মৃত্যু আরেক দিক দিয়ে তাঁর মনের বিকাশ স্তব্ধ করে দিয়েছিল, যার জন্য বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; অসম্পূর্ণ রচনা "বর্ণমালাতত্ত্ব" তারি নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়াস আর দেখা গেছে বলে শুনিনি। সাধারণ পাঠকের ধারণা যে কোনো ভাষার বর্ণমালার বর্ণগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই ; কিন্তু অন্য বর্ণের সঙ্গে মিলিত হলে যে সব শব্দের সৃষ্টি হয়, তার

অর্থ থাকার সম্ভাবনা আছে। তাও যেমন তেমন ভাবে একসঙ্গে করে কটা বর্ণ গেঁথে দিলেও চলবে না, এখন লোকে যাই বলুক না কেন, গোড়ায় ব্যাকরণের ছাড়পত্র না পেলে, শব্দের কোনো অর্থলাভ হত কিনা সন্দেহ। 'বর্ণমালাতত্ত্ব' পড়লে এ ধারণাকে অ-পক্ক ও অসম্পূর্ণ মনে হয়। বর্ণের যে অর্থ না থাকলেও একটা ইঙ্গিত থাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সে কথা মানেন। সেই ইঙ্গিতগুলি এখানে কবির হাতে ধরা দিয়েছে।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা তাৎপর্য দিয়েছেন কবি, কিন্তু আলাদা হলেও, পরস্পরকে নইলে তাদের চলে না।

"স্বর ব্যঞ্জন যেন দেহ মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আর থাকিতে পারে না, প্রাণহারা যেন প্রাণী।"

স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনকে যেমন উচ্চারণের সব সম্ভাবনা সত্ত্বেও বোবা হয়ে থাকতে হয়, তেমনি ব্যঞ্জন ছাড়া স্বরও যেন অবলম্বন না পেয়ে অবয়বহীন হয়ে শূন্যে কেঁদে বেড়ায়। কবি লিখছেন,

"জাগে হাহুতাশ স্বরের বাতাস জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি,
ফিরে দিশেহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি!
অ-আ-ই-ঈ-উ-ঊ হাহা হিহি হুহু, হাল্কা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের বলন নিশ্বাসে আসা যাওয়া,
খেলে কি না খেলে ছায়ার আঙ্গুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,
অলস বিভোর, আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা!"

একা স্বরবর্ণ বাতাসে ভেসে যায়, তাই ব্যঞ্জনকে দরকার হয়, কায়া দিয়ে তাকে ধরে রাখবে বলে।

"তবে আয় নেমে আয় জড়ের সভায় জীবনমরণ দোলে,
আয় নেমে আয় ধরণী ধূলায় কীর্তন কলরোলে,
আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্ণে, কাকুতি করিছে সবে
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে প্রভাতে কাকের রবে।"

এমনি করে মাথার মধ্যে বন্ধ ছিল যে জিজ্ঞাসা, সে উচ্চারণে মুক্তি পেল।

"আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কণক কিরণমালা,
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্ব জঠরে প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে—'কই, কেগো, কোথায়, কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি?'
কহে, 'কহ কহ কেন অহরহ কালের কবলে থাকি?'
কহে কানে কানে করুণ কূজনে, কলকল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে কলহ কুহরে কাষ্ঠ কঠোর হাসে।"

কয়ের পালা শেষ করে কবি বলছেন,

"খালি কর্তালে কভু কীর্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটি-পেটা!
নামাও আসরে কয়ের দোসরে, খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা!
এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলেনি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া কি খেলা খেলিলি পাখি!
খোল করতালে, খোলসা খেয়ালে, খোল খোল খোল বলে,
শখের খাঁচার খিড়কি খুলিয়া খঞ্জ খেয়াল চলে!"

খয়ের পরে গ আসে—

"গগনে গগনে গোধূলি লগনে মগন গভীর গানে,
করে গমগম আগম নিগম গুরুগম্ভীর ধ্যানে।
গিরি গহ্বরে অগাধ সাগরে গঞ্জে নগরে গ্রামে,
গাঁজার গাজনে গোষ্ঠে গহনে গোকুলে গোকুলধামে।"

দুঃখের বিষয় চ-য়ের পালা শেষ করে কবিতাও শেষ হয়ে গেছে।

তেরো

সুকুমারের কবিতাগুলি পড়ে কেবলি মনে হয় রস জমাতে হলে, তা সে যে-রসই হোক না কেন, শুধু পরিস্থিতি পরিকল্পনা, চিত্র-রচনা বা ভাবব্যঞ্জনা যথেষ্ট নয়, তার যোগ্য ভাষা যোগাতে হবে।

সুকুমারের রচনায় ভাষা পরিস্থিতির রসটিকে প্রকাশ করে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। সত্যিকার রস জমে সেখানে যেখানে ভাষা ভাবের বাহনমাত্র হয়ে থাকে, তাকে লঙ্ঘন করে যেতে চায় না। শোনা যায় ওস্তাদ অশ্বারোহীকে দেখলে ঘোড়া আর মানুষ দুটিকে আলাদা প্রাণী বলে মনে হয় না। এখানেও তাই, ভাব যতই অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত বা খেয়ালী হোক না কেন, ভাষা তাকে প্রকাশ করবে এমনি অবলীলাক্রমে যে, যে শুনবে তারি মনে হবে, তাই তো, এই ভাষার জন্যই তো এই ভাবটি অপেক্ষা করে ছিল। এক্ষেত্রে ভাষা কখনো নিজের অদ্ভুত-ত্ব দিয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, ভাবের ধারা থেকে তাকে ভ্রষ্ট করবে না।

ভাব যেখানে রস জমাতে বিফল হয়, শুধু সেইখানেই ভাষা নিজের চাতুরি দিয়ে ঘাটতি পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেছিলেন—"মন যখন দেউলে হয়, লেখক তখন কথার খেলাতে নামেন।" অবশ্য সাহিত্য জগতের কোনো সীমানা না থাকাতে, কথার খেলারো যথেষ্ট অবকাশ আছে। শুধু এইটুকু বলা চলে যে রস যেখানে অন্য তহবিলে জমা হচ্ছে, কথাকে সেখানে সংযম মেনে চলতে হয়। কিন্তু কথার খেলারো অন্যরূপে চমৎকারিত্ব আছে; এবং স্থলবিশেষে কবিতায় সে অলঙ্কার হয়ে শোভা পায়। সুকুমারের বিখ্যাত কবিতা খাই-খাই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শব্দ-কল্প-দ্রুম ও দাঁড়ের কবিতারো তুলনা হয় না। শব্দ-কল্প-দ্রুম শুরু হচ্ছে ঃ

"ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা;
ফুল ফোটে ? তাই বল, আমি ভাবি পটকা।
শাঁই শাই পন পন, ভয়ে কান বন্ধ,
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ !

* * *

ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজেরে
ফটফট বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝেরে !

হৈ-হৈ মার মার বাপ্ বাপ্ চীৎকার,
মালকোঁচা মারে বুঝি ? সরে পড় এইবার।"

দাঁড়ের কবিতাও মন্দ নয়।

"এক ছিল দাঁড়ি মাঝি, দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি মাঝি দাঁড়ে খালি ঘষত।
সেই দাঁড়ে এক দিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগে মেগে বাড়াবাড়ি ঐ তো !
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো !
ভারি তোর দাঁড়িগিরি ; শোন্ বলি তবে রে,
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে ?

* * *

দূর দূর ছাই দাঁড়ি, দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে !
দাঁড়ি বলে—বাস্ বাস্ ঐখানে দাঁড়ি দে !"

'খাই-খাই'এর স্থান আরো উঁচুতে, শুধু কথার খেলার জন্য নয়, এর প্রসাদগুণের তুলনা হয় না।

"খাই-খাই কর কেন, এসো বস আহারে,
খাওয়াব আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালীর ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য।"

তা ছাড়া আরো খাওয়া আছে,

"টোল খায় ঘটিবাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁত খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা—" ইত্যাদি।

বর্ণমালাতত্ত্বের অনুপ্রাসের প্রাচুর্যের কথা না বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। একটু শুনলেই কান তার চমৎকারিত্ব আপনি ধরে নেবে, কোনো ব্যাখ্যানার প্রয়োজন নেই।

"আধো আধো ভাষা আলেয়ার আসা, আপনি আপন হারা,
আদিম আলোতে আবছায়া পথ, আকাশ গঙ্গা ধারা,
ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয়-দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইসারা আভাসে ঈঙ্গিতে ভাষে, রহ-রহ ইহকালে।
কেন ইতিউতি, উতলা আকূতি, উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে উর্ধ্বমুখী।"

আরো আছে,

"কবি কল্পনে কাব্যে-কলায় কাহারে করিছ সেবা ?
কুবের কেতনে কুঞ্জ কাননে কাঙাল কুটিরে কেবা ?
কায়দা কানুনে কার্যে কারণে—কীর্তিকলাপ মূলে,
কেতাবে কোরাণে কাগজ কলমে কাঁদায়ে, কেরানী কুলে ?
কথা কাঁড়ি কাঁড়ি, কত কানাকড়ি, কাজে কচু কাঁচকলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্তা কলার, কভু কৌপিন ঝোলা ?"

সত্যি কথা বলতে কি, কথার খেলার নিজস্ব যে রস, তাতে সুকুমারের খেয়ালী মন মাঝে মাঝে ডুব দিত।

তারপর তাঁর ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা বলতে হয়। উপরের উদ্ধৃতি-গুলিতে প্রতি পদের অষ্টাদশ অক্ষর চিত্তকে আকৃষ্ট না করে ছাড়ে না। অষ্টাদশ অক্ষরে, তাল না কেটে, কাব্যরচনা খুব সহজও নয়, খুব বেশি কবি চেষ্টাও করেন না। সুকুমারের রচনায় ক্বচিৎ ছন্দো-পতন হয়, বরং একথা বলা চলে যে মিলের অশুদ্ধি যদি বা চোখে পড়ে, ছন্দের দোষ খুঁজতে হয়।

কুড়ি অক্ষরের লাইনেও ছন্দ নিখুঁত—

"চলে খচখচ রাগে গজগজ জুতা মচমচ তানে,
ভুরু কটমট, ছড়ি ফটফট, লাথি চটপট হানে।

দেখে বাঘ রাগ লোকে ভাগ ভাগ করে আগবাগ থেকে,
ভয়ে লাফঝাঁপ বলে বাপ বাপ সব হাবভাব দেখে।"

সহজ ছন্দগুলির কি মোলায়েম স্রোত,

"ঠাকুরদাদার চশমা কোথা?
ওরে গণ্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌ না হেথা, দেখ্‌ না হোথা,
খোঁজ্‌ না নিচে গিয়ে।
কই কই কই? কোথায় গেল?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘর দোর সব উল্টে ফেল,
খোঁচাও লাঠি দিয়ে॥"

ছন্দের যিনি রাজা তিনি ছন্দকে কখনো একঘেয়ে হয়ে যেতে দেন না।

"কেন সব কুকুরগুলো খামোকা চেঁচায় রাতে?
কেন বল দাঁতের পোকা থাকে না ফোকলা দাঁতে?
পৃথিবীর চ্যাপটা মাথা, কেন সে কাদের দোষে?
—এসো ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে!"

এসবের সঙ্গে তুলনা করলে সুকুমারেরই লেখা গানের পদগুলি কানে আরো মধুর হয়ে ধরা দেয়।

"প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে,
নীরব গানে গানে পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে অরূপ সাজে,
পুণ্য মধুর ভাতি, পূর্ণ মধুর রাতি
মধুর স্বপনে সাজি, মধুর রাজে।"

লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখেন নি এই কবি। জীবনের ছত্রিশটা বছর রঙ দিয়ে সুর দিয়ে ভরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঐ যে

খসড়ার খাতার কথা আগেও বলা হয়েছে, তাতে এই লাইনগুলি লেখা আছে ঃ—

"বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিম্বা অন্য কেউ,
আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগর ভরা ঢেউ।
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে,
যে দিক দিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে!
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে,
জীবনটাকে হাঁকাই নে কো মনের রসে জুতে।"

ইংরেজ লেখকের মতে, কবিতা হল a criticism of life, অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপর একটি মন্তব্য, কিম্বা জীবনের সমালোচনা। উপরের ঐ কটি কথায় সুকুমারও তাঁর মন্তব্য দিয়েছেন।

চৌদ্দ

১৯১৩ সাল থেকেই সন্দেশের পাতার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমারকে চিনত। মাসের গোড়ায় যেই না সন্দেশ-খানি হাতে পেল, অমনি সবার আগে শেষের দিকটা দেখা হত। না জানি এবার আবোল-তাবোলের কি লেখা কি ছবি বেরুল! তাঁর ছোট গল্পগুলিও কম উল্লাসের সৃষ্টি করে নি। এর আগে যে বাংলার ছোট ছেলেরা হাসির খোরাক একেবারে পায় নি এমন নয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অপূর্ব কবিতার অনাবিল হাস্যস্রোতের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু এমন খেয়ালী ভাষায় এমন খেয়ালী লেখা বাংলা দেশে কে কবে লিখেছিল? তবে একেবারেই লেখে নি তাও নয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত কঙ্কাবতী ইত্যাদির কথা ভুলে গেলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও এসে পড়ে; কঙ্কাবতীর গল্পের মোটামুটি ঘটনা ছোটদের উপযুক্ত করে বলা গেলেও, গল্পের মূল

রসটি আদৌ শিশুদের জন্য নয়। অনেক বিচক্ষণ সাহিত্য রসিকের মতেই অনাবিল হাস্যরসে ভরা, উঁচুদরের খেয়ালী লেখা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমারের হাতেই প্রথম পেয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব খেয়ালী লেখার খেই ধরা সব সময় ছোটদের কর্ম নয়; সুকুমারের কাছে তারা পেল সহজ ভাষায় লেখা সহজবোধ্য স্বচ্ছ আজগুবী, যার মাথামুণ্ডু কিন্তু দিব্যি চেনা যায়। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা কর্কশতা নেই; উদ্ভটত্ব থাকলেও সেটা বিভীষিকাময় নয়। এখানে সব কিছু অদ্ভুত কিন্তু উৎকট নয়, বেয়াড়া কিন্তু বিকট নয়, সৃষ্টিছাড়া কিন্তু ছন্দোময়।

সুকুমারের কাব্যরচনা বাদ দিলে যা বাকি থাকে, তার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও তাঁর অল্প পরিসরের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট গল্পের দুটি বই, পাগলাদাশু ও বহুরূপী; একটিমাত্র বড় গল্প হ-য-ব-র-ল; একখানি নাটক সংকলন আর বর্ণমালাতত্ত্বের মধ্যে গ্রথিত বিবিধ প্রবন্ধ। যদিও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যরত্নের মধ্যে তরুণ কবিদের লেখা অনেক সৃষ্টিই আছে। শেলি কীটসের রচনাসম্ভার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কি শেক্সপীয়রও তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রায় সবগুলিই চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করার আগেই লিখেছিলেন, তবু গদ্য রচনার বেলায় অন্যরূপ মনে হয়। কিছুদিন শিক্ষানবিশী এবং অভ্যাস না করলে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হাত পাকে না। সুকুমারের গদ্যরচনাও নিঃসন্দেহ সময় পেলে আরো পাকা চেহারা নিত; তবু সেগুলিতে যে স্থিরদৃষ্টি ও গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, বয়সের কথা চিন্তা করলে সেটা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর।

সমরসেট মমের মতে কাব্যের আবেদন চিরন্তন, কিন্তু গদ্যের আবেদন মাত্র দুই পুরুষব্যাপী। তার কারণ হল যে গদ্য সাধারণতঃ বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। যার প্রধান উপকরণই বাস্তবজীবন, তার মর্মকথাটি চিরন্তন হলেও, যে পটভূমিকা ও

ঘটনাবলীকে আশ্রয় করা হয়, দুই পুরুষ কেটে গেলে সে-সবকে সেকেলে বলে মনে করা হয়। ততদিনে বাস্তবজীবনে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, অভিনব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভাষার দিক থেকে বিচার করতে গেলেও, সচল সজীব না হলে গদ্যের ভাষা মনে সাড়া জাগাতে পারে না। যে ধরনের কথাবার্তা আজকাল কেউ বলে না, গল্পে-প্রবন্ধেও তার ব্যবহার চলতে পারে না। গদ্যের ভাষাকেও সাধারণতঃ বর্তমানধর্মী হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ উপন্যাস গোরাকে এখন আর তেমন চাঞ্চল্যকর বলেও মনে হয় না, সাধারণ পাঠকরা তেমন আগ্রহ করে পড়েও না। তার কারণ গোরার কাহিনীর মূলে যে সমস্যা, সেটিও বিগত যুগের। তাছাড়া কথোপকথনের ভাব ও ভাষাকে প্রায়ই একটু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। গোরা রচনার সময় সামাজিক জীবনে মেয়েরা বড় একটা স্থান নিত না, কাজেই বয়স্ক অবিবাহিত প্রগল্‌ভ মেয়েদের বিষয়ে কবিগুরুর কল্পনা করতে কষ্ট হয়েছিল। ফলে ললিতা একটি এঁচোড়ে পাকা জ্যাঠা মেয়েতে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু শেষের কবিতার সময় সে রকম মেয়ের যুগ এসে পৌঁছেছিল। 'গোরা'য় তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েদের মুখে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে রকম পাকা পাকা কথা কবি পুরেছেন, বর্তমান পরিবেশে সেসব কেউ বরদাস্ত করত না। ভেবে দেখলে এখন হাসি পায়। আগেকার অনেক বইয়েরই এই পরিণাম। কিন্তু হ-য-ব-র-ল বা শেষের কবিতার আদর সহজে কমে না। তার কারণ ছোটদের জন্য লেখা বই আর রসরচনা অনেকটা কাব্য-ধর্মী। কাব্যের সর্বজনীনতা ও চিরন্তন আবেদন তাদের মধ্যে দেখা যায়। ছোটদের গল্পের বিষয়বস্তুতেই একটা চিরকেলে ভাব আছে, যেমন সব দেশের উপকথাতে রূপকথাতে আছে। এসব কাহিনী স্থানকালপাত্রে ভেদ না রেখে, হৃদয়ের মূলে আঘাত করে।

ছোটদের গল্পের ভাষার মধ্যেও এমন একটা সাবলীল ভাব থাকে যে অনেক দিন ধরে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এমন কি 'কঙ্কাবতী'র ভাষার সেকেলে ভাবটিও বড়ই উপভোগ্য।

তবে কঙ্কাবতী রূপকথা জাতীয় গল্প, বাস্তব জীবন ঘেঁষা গল্পের কথা আলাদা। তার ভাষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।

সুকুমারের 'পাগলা দাশুর' কথাই ধরা যাক। বইয়ে আছে ২০টি গল্প, সবই স্কুলের ছেলেদের বিষয়। যদিও দু-একটি গল্পের অকুস্থল বাড়িতে, তবু পাত্ররা সকলেই হয় স্কুলে যায়, নয়তো শীঘ্রই যাবে। গুণেগুণে গুটি দুই গল্পে ছাড়া কোথাও কোনো স্ত্রীচরিত্রের অবতারণা নেই, যদিও দু-এক ক্ষেত্রে অন্তরালে মা কিংবা দিদি অশান্তি ঘটাবার জন্য প্রস্তুত আছেন। গল্পের বিষয়বস্তুতে কালের ছাপ পড়েনি। কারণ স্কুলের ছোট ছেলেদের সমস্যা প্রায় সবই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে; হয়তো সামান্য একটু ভোল বদলেছে। সেই বাড়ির সতর্ক প্রহরা, মাস্টারমশাইদের নির্মম কর্তব্যনিষ্ঠা, সেই পরীক্ষার দুশ্চিন্তা, প্রতিযোগিতার অনিশ্চয়তা, সেই যখন-তখন হাসিঠাট্টা ও তার অশুভ পরিণাম।

স্কুলের ছেলের মজাগুলোও চিরন্তন, তারো অবশ্য কিঞ্চিৎ এদিক-উদিক হয়েছে। তবু এখনো তারা খেলাধুলো, ম্যাজিক, নাটক ইত্যাদি দেখে সমান আনন্দ পায়। এখনো অদ্ভুত ছেলেরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে ক্লাসে ভর্তি হয়; অবশ্য দাশুর মতো ছেলে খুব বেশি দেখা যায় না, তখনো যেত না। মোট কথা পাগলা দাশুর মালমশলা সহজে বদলাবার মতো নয়। সুকুমারের ভাষারো একটা নিজস্ব প্রাণশক্তি আছে, তার পক্ষেও সেকেলে হয়ে যাওয়া সহজ নয়। পুনর্মুদ্রণের সময়ে যদি এই সব গল্পের ক্রিয়াপদগুলিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে দেওয়া যায়, তাহলে কে বলবে তারা কালই লেখা হয়নি? বড় জোর মনে হতে পারে কিছুকাল

আগেকার ঘটনা নিয়ে গল্প। টমাস হিউস্‌এর 'টম ব্রাউন্‌স্‌ স্কুল ডেজ্‌' আজকাল কজন পড়ে? ওরকম ফেনিয়ে ফেনিয়ে ছোটদের জন্য আজকাল বই লেখা হয় না। সুকুমারের পাগলা দাশুর গল্প সংক্ষিপ্ত ও সচল। কুড়িটি গল্পের মধ্যে এগারোটির ক্রিয়াপদগুলি শুদ্ধ ভাষায় লেখা, যদিও কথাবার্তা সবই চলতি ভাষায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে গল্পগুলি চুয়াল্লিশ থেকে প্রায় চুয়ান্ন বছর আগেকার রচনা। তখন পরীক্ষার খাতায় শুদ্ধভাবে 'করিয়াছিল' 'খাইয়াছিল' না লিখলে নম্বর কাটা যেত। পণ্ডিতরা বলতেন রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ কথিত ভাষা চালাতে চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ করছেন। তখনকার সন্দেশের তরুণ পাঠক পাঠিকাদেরো একদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হত, সুতরাং কথিত ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদের চলবে কেন? এই একটি বিষয় ছাড়া গল্পগুলির সুরটি এত বেশি আধুনিক যে পড়ে আশ্চর্য হতে হয়।

নমুনাস্বরূপ একটি গল্পের ক্রিয়াপদগুলিকে সামান্য বদলিয়ে সংক্ষেপে শোনাচ্ছি। এ লেখার রচনার তারিখ কে অনুমান করতে পারবে? তবে হ্যাঁ, ছেলেদের নামগুলো এখন আর চলবে না!

"কালাচাঁদ নিধিরামকে মেরেছে, তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করেছে। হেডমাস্টার এসে বললেন—কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ?' কালাচাঁদ বলল 'আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচে দিয়েছিলাম আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।' হেডমাস্টার বললেন, 'কেন ওরকম করেছিলে?' কালাচাঁদ খানিকটা আমতা-আমতা করে মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে, ও খালি-খালি আমাকে চটাচ্ছিল।'

পরে ছেলেরা কালাচাঁদকে চেপে ধরেছিল, চটাচ্ছিল আবার কি? শেষ পর্যন্ত নিধিরামই ব্যাপারটা খুলে বলল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে; ছবির নাম খাণ্ডবদাহন। আমি বললাম

—'এটা কি এঁকেছ ? মন্দিরের সামনে শেয়াল ছুটছে !' কালাচাঁদ বলল—'না, না, মন্দির কোথায় ? ওটা হল রথ, আর এগুলো তো শেয়াল নয়, রথের ঘোড়া।'

'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন ? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন ?'

'আহা তা কেন, ওটা তো সূর্য নয়, সুদর্শন চক্র।···আর এই বুঝি চামচিকে হল ? এটা তো গরুড় পাখি একটা সাপকে তাড়া করেছে।'

'তা হবে—···আচ্ছা এক কাজ কর না, ওটাকে খাণ্ডবদাহন না করে, সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন ? গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। রথটার মাথায় জটাজূটো দিয়ে অগ্নিদেব বানাও। কৃষ্ণ অর্জুন হবেন রামলক্ষ্মণ।······সুদর্শন চক্রে নাক-হাত-পা জুড়ে দিলেই বিভীষণ হয়ে যাবে।······চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে, ···ডানা দুটো মুছে দাও, ওটা হনুমান হবে।' কালাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।' 'তাহলে ভাই এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও। ···কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফদাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দাও। ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। শিশুপাল তো আছেই, গাছটার একটু নাক মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে।'

কালাচাঁদ চটে বলল,······'থাক, থাক, অত বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই।'

আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই ? আমার কথা-মতো না করে, অন্য একটা কিছু কর না। মনে কর ওটাকে সমুদ্র-মন্থন করে দিলেও তো হয়। ধোঁয়া-ওলা গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী···সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে, অর্জুনের

পিছনে কতকগুলো দেবতা এঁকে দাও ···আর চামচিকের দিকে কতকগুলো অসুর। ······'"

এই পর্যন্ত শুনে কালাচাঁদ যে নিধিরামকে পেটাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

গল্পের কি সাল তারিখ হয়?

ভালো ছোট গল্পের সব গুণই আছে এসব গল্পে। বাড়তি কথা নেই, অতিরিক্ত ঘটনা নেই, অনাবশ্যক ভূমিকা নেই, পাঠক প্রথম পদক্ষেপেই একেবারে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করে। উপরন্তু লেখক নিজে এসে কোথাও নাক গলান না, বুড়োটে উপদেশ দেন না; একেকটি গল্প যেন চাঁচাছোলা নিটোল একেকটি শিল্পকর্ম।

"বহুরূপী" আরেকটি ছোট গল্পের বই, কিন্তু এর গল্পগুলি একেবারে অন্য ধরনের, যেন রূপকথার মতো; এখানেও সেই নিখুঁত মাত্রাজ্ঞান, বাড়তি একটি কথাও নেই। তেরোটি গল্প আর মাঝে মাঝে পাতার নিচের দিকে একেকটি খুদে কবিতা, কিন্তু সে কি কবিতা! দুটো একটা বলি, যেমন—

'নন্দঘোষের শামলা গরু, ভাগল কোথায় লক্ষ্মীছাড়া,
নন্দ ছোটে বন বাদাড়ে, সন্ধানে যায় বস্তি পাড়া।
শেষ কালেতে অর্ধরাতে হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে,
বাসায় দেখে ঘুমোয় গরু ল্যাজ গুটিয়ে, গোয়াল ঘরে।'

আর লেখকের নিজের হাতে আঁকা ছবি যেন সোনায় সোহাগা। আরো আছে।

'জংলা বনে পাগলা বুড়ো আমায় এসে বলে,
আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁঠাল কত ফলে?
আমিও বলি আন্দাজেতে—বলছি শোন কত,
তোমাদের ঐ ঝিঙের খেতে চিংড়ি গজায় যত।'

এ বইয়ে নানারকম গল্প, নতুন গল্প, পুরনো গল্প, বানানো গল্প, শোনা গল্প, অন্য দেশ থেকে ধার করা গল্প। ছোটদের গল্পের

বিষয়বস্তুর চেয়েও যে গল্প বলাটা আসল জিনিস। এই বই তার আরেকটি প্রমাণ। যে গল্পের সাফল্য শুধু ঘটনার পরিণতির উপর নির্ভর করে, সে গল্প একবার পড়া হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যায়। এমন কি অনেক সময় গল্পের শেষাংশটুকু আগে পড়ে ফেললে, বাকিটাতে আর কোনো রস পাওয়া যায় না। এসব হল দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প। আজকালকার জনপ্রিয় রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনীর বেশির ভাগই এই ধরনের। জানা গল্প যদি বারে বারে পড়লেও, তাতে নব নব রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই হল সেরা গল্প। এই বইয়ের অনেক গল্পই তাই। ছোটরা এই গল্পই চায়, যা কিছুতেই পুরনো হয় না, যার একটি কথাও বদলালে আপত্তির কারণ দেখা দেয়।

বহুরূপীর একটি ছোট গল্প সংক্ষেপে বলি,

"রাজবাড়ি যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙদের পুকুর। একদিন সর্দার ব্যাঙ বড় বেশি উঁচুতে লাফ দিয়ে, দেয়াল ডিঙিয়ে রাজপথে পড়ে দেখে মাথায় মুকুট, গায়ে রঙিন পোশাক, চতুর্দোলায় চেপে, দেশের রাজা যাচ্ছেন আর লোকরা সব রাজা-রাজা-রাজা-রাজা বলে নমস্কার করছে। রাজামশাই খুশি হয়ে এর দিকে ওর দিকে তাকাচ্ছেন আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে সর্দারের বড় শখ হল ব্যাঙদেরো একজন রাজা থাকুক। রাজার জন্য দরখাস্ত করা হল। ব্যাঙ পুকুরের ব্যাঙ দেবতা, যিনি বাদলা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন······তিনি বললেন 'এই নে রাজা!' বলে, মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন। ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চকচক করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙদের ফুর্তি আর ধরে না।

······কিন্তু শেষটা একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নি বলল, 'এ রাজা

নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না, ছাই রাজা!'……আবার দরখাস্ত হল, রাজা চাই, ভালো রাজা, নতুন রাজা। ব্যাঙ দেবতা এবার একটি বককে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নে তোদের নতুন রাজা!'

ব্যাঙরা অবাক হয়ে বলতে লাগল—কি প্রকাণ্ড রাজা, চকচকে ধবধবে সাদা, ভালো রাজা, সুন্দর রাজা! রাজা, রাজা, রাজা, রাজা! দুঃখের বিষয় ভালো রাজাটি খিদে পেলেই একটি করে ব্যাঙ তুলে টুপ করে মুখে ফেলেন। সর্দার গিন্নি তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, 'ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝকঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো দু পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভাল নয়, তুই আমাদের খাস্ কেন?……ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা রাম রাম রাম রাম অমন আর কক্ষনো করিস্ না।'

বক রাজা টপ করে সর্দার গিন্নিকে গিলে ফেললেন। তখন সবাই মিলে ব্যাঙ দেবতাকে বলতে লাগল…চাই না চাই না চাই না চাই না, রাজা চাই না, রাজা চাই না!

ব্যাঙ দেবতা বললেন—'আবার কি হল?'

ব্যাঙরা কেঁদে পড়ল—'কি দুষ্টু রাজা, নিয়ে যাও! নিয়ে যাও।' ব্যাঙ দেবতা হুস্ করে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে গেল।"

পুরনো চেনা গল্প নতুন করে লেখা।

বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা আর সব বই থেকে আলাদা হল হ-য-ব-র-ল। একমাত্র লুইস্ ক্যারলের অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডের সঙ্গে এর তুলনা হয়। নিন্দুকরা মাঝে মাঝে বলেন এ বইটা নাকি তার হুবহু নকল। কথাটা ঠিক নয়; তবে গল্পের অনুপ্রেরণা যে সেখান থেকেই এসেছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই; সেই গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়া, সেই অদ্ভুত বেড়াল, সেই মাথামুণ্ডু কথাবার্তা, সেই বড়দের ডাকে জেগে ওঠা।

সাদৃশ্য কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; হ-য ব র ল'র রসটি নিতান্ত নিজস্ব, সম্পূর্ণ দেশী ব্যাপার। এর আগেই বলা হয়েছে গল্পের চেয়ে গল্প বলাটা বড় কথা, এর বেলাতেও তাই। মোটামুটি গল্পটা শোনা যাক, তবে এমন আজগুবী গল্প সংক্ষেপে বলাই মুশকিল। একটা লম্বা শোভাযাত্রার প্রত্যেকটা লোক যদি আলাদা রকমের দেখতে হয়, আলাদা রকমের কিন্তু সমান অদ্ভুত কাণ্ড করে, তাহলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যেমন শক্ত ব্যাপার হয়, এ-ও তাই। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলা যায়, সবাই সমান মজার। তবু গল্পটা শোনাই যাক।

গাছতলায় শুয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে রুমাল খুঁজছি, রুমাল বললে ম্যাও! দেখি সেটা একটা লাল বেড়াল হয়ে গেছে ; সে বললে, তাকে নাকি চন্দ্রবিন্দুও বলা চলে। তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে, চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা, হল চশমা! এর আর বোঝাবুঝির কি আছে। এখন কথা হল গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে তিব্বত গেলেই হয় ; খুব দূরও নয়, কলকাতা ডায়মণ্ডহারবার রানাঘাট তিব্বত, ব্যস! গেছো দাদার কাছে শুধু পথটা জেনে নিতে হয়। তাঁকে আবার ধরা মুশকিল, কোথায় যে কখন থাকেন তার ঠিক নেই। হিসাব কষে কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বেড়াল বললে, "চোখ বোজ ; আমি যা বলব মনে মনে তার হিসেব কর।" যেই না চোখ বোজা অমনি বেড়ালও হাওয়া!

সঙ্গে সঙ্গে শ্লেট ও পেন্সিল সহ কাক্কেশ্বর কুচকুচে দাঁড়কাকের আবির্ভাব ও হিসাব কষণ।

"সাত দুগুণে কত হয়?" বলা হল চোদ্দ। কাক্কেশ্বর বললে, "হয়নি, হয়নি, ফেল।" আমার ভয়ানক রাগ হল, "নিশ্চয় হয়েছে।" শেষ অবধি কাক মেনে নিল, "সাত দুগুণে—চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।"

এর- পর গাছের ফোকর থেকে সুড়ুৎ করে হুঁকো হাতে দাড়িওয়ালা বুড়ো উদোর অবতরণ ও কাক্কেশ্বরের সঙ্গে হিসাব নিয়ে

খ্যাঁচাখেঁচি। তার মধ্যে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। ফিতে দিয়ে আমাকে মেপে বলে কিনা, ছাতিও ২৬ ইঞ্চি, খাড়াইও ২৬, গলাও ২৬, তবে কি আমি শূওর? দেখ গেল ফিতের সব দাগ মোছা, শুধু ২৬ টাই পড়া যাচ্ছে। তারপর বয়সের কথা হতে ওরা বললে, 'বাড়তি না কমতি?' সে আবার কি? না, ওদের বয়স নাকি চল্লিশ অবধি বাড়লেই মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যখন কমতে কমতে দশে নামে, তখন ফের বাড়ায়। শুনে আমি অবাক। তারা বললে, 'তা না হলে বয়সটা বেড়ে বেড়ে আশী-নব্বুই হোক আর আমরা বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

তারপর বুধো এল, উদোর পিঠে বুধো চাপল। তারপর একটা জন্তু এল, মানুষ না বাঁদর না প্যাঁচা না ভূত কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, সে খালি অদ্ভুত সব ব্যাপার কল্পনা করে আর বেজায় হাসে। জন্তুটার নাম হিজিবিজবিজ। তারপর বি-এ পাস ছাগল ব্যাকরণ সিং এসে তার দুঃখের কথা বলে খানিক কেঁদে নিল, এমন সময় ন্যাড়া এসে জোর-জার করে তার কবিতা শোনাবেই। তার মধ্যে আবার একটা হল বাদুড় ও সজারুর বিষয়ে। সজারুর গিন্নির কথাও আছে, নাকি চ্যাচামেচিতে তার ঘুম ভেঙ্গে যেতেও পারে। তাই শুনে বাদুড় নাক সিঁটকে বলল—

> "ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুষো আঁধারে?
> গিন্নি তোমার হোঁৎকা এবং হাঁদাড়ে!"

এই কবিতার কথা জানাজানি হতেই সজারু একটা মানহানি মোকদ্দমা ঠুসে দিল। হুতোম প্যাঁচা হল জজ, আগাগোড়া চোখ বুজে বসে রইল। কুমীর মামলা বাতলাল—মানহানি অর্থাৎ মান, তার মানেই কচু ইত্যাদি। সবাই জানতে চায় কোন্ কবিতা নিয়ে মামলা। ন্যাড়ার কবিতার তোড়া থেকে কুমীর ভুল-ভাল কবিতা পড়তে লাগল, শেষে ন্যাড়াই কবিতাটা বের করে দিল। তারপর সাক্ষী দরকার। চার আনা পয়সা দিয়ে হিজিবিজবিজকে সাক্ষী মানা হল। সে বললে, "একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব

জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম পরমকল্যাণ-বরেষু, কিন্তু যেই না তার বাড়ির নাম রেখেছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি পড়ে গিয়েছে! হো হো হো হো।"

শেয়াল হল উকীল, সে বললে, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মুক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।' কুমীর রেগে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।'

এই সবের মধ্যে বিচার সভায় একটা গোলমাল দেখা দিল। জজ বললেন, 'সবাই চুপ কর; আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' তা তো দেবেন, কিন্তু আসামী কই? ঐ যাঃ! আসামী তো নেই। ভুলিয়ে-ভালিয়ে অনেক কষ্টে হ্যাড়াকে আসামী খাড়া করা হল। সে ভেবেছে সাক্ষী যখন পয়সা পেল, সে-ও নিশ্চয় পাবে। জজ রায় দিলেন—হ্যাড়ার তিন মাস জেল আর সাত দিনের ফাঁসি!

এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার আগেই সব ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে গেল, মেজোমামা আমাকে কান ধরে উঠিয়ে দিলেন—"ব্যাকরণ শিখবার নাম করে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে ও—ও!"

এই তো হল গল্প; গল্পাংশ বলতে বিশেষ কিছু নেই; ঘটনার পারম্পর্য ও পরিণতি খোঁজা বৃথা, আজগুবীর দেশে সব কিছু আজগুবী নিয়মে চলে। তবে ঘটনা বা কথাবার্তা মোটেই এলোমেলো নয়, তার মধ্যে দিব্য একটা পারিপাট্য আছে, এক-একজনা কথা শেষ করে আরেকজনের হাতে গুছিয়ে গল্পটি তুলে দিচ্ছে। অতিরিক্ত আড়ম্বর অনিশ্চয়তাও কোথাও নেই। শেষ লাইন অবধি পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, তারপর না জানি কে এল! রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে হয়, কারণ বাস্তবজগতে যদি বা যুক্তি খাটিয়ে, গল্পের শেষটি আঁচ করা যায়, এক্ষেত্রে যুক্তিটুক্তি অচল, কাজেই গল্পের সমাপ্তি অপ্রত্যাশিত। রসের রাজ্যে যেমন হওয়াই উচিত।

॥ ষোল ॥

রস-রচনার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই; চার্লস্ ডিকেন্স পিকউইক পেপার্স যখন লিখেছিলেন, তাঁর বয়স ছিল তেইশ-চব্বিশ; কিন্তু আমাদের রসরাজ রাজশেখর বসু আধবুড়ো হবার আগে, কেউ তাঁর রসের সাগরের সন্ধান পেয়েছিল কি? ভোরবেলার খেজুর গাছের ঠাণ্ডা টলটলে রসও মিষ্টি, আবার উনুন ধরিয়ে দীর্ঘ সময় জ্বালে বসিয়ে যে লালচে সুগন্ধি নলেন গুড় তৈরি হয়, সেও মিষ্টি। তবে সে অন্য রকম মিষ্টি, অন্য কাজে লাগে।

রসই ছিল সুকুমারের মূলধন। তিনি বলতেন হাস্যরস ও গম্ভীর রস একই সঙ্গে অবস্থান করে। তা করলেও, গম্ভীর বিষয়ে গদ্য রচনার প্রকাশধর্ম সাধারণতঃ একটু আলাদা হয়। হাসি আলোর মতো জ্বলে উঠে চারদিক আলো করে দেয়, সেই আলোতে সত্যের রূপটিও স্পষ্ট করে দেখা যায়। গম্ভীর গদ্য রচনার বিষয়বস্তুকে লেখক সাধারণতঃ মনের মধ্যে পাক দিতে থাকেন। এইখানেই অভিজ্ঞতার কথা ওঠে; বাস্তব জগতেই হোক বা সাহিত্য জগতেই হোক, যত দিন যায়, তত বেশি দেখবার শুনবার বুঝবার বাছাই করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

ইংরেজিতে mull বলে একটা শব্দ আছে। পানীয়ের সঙ্গে নানান্ মশলাদি মিশিয়ে জারিয়ে-জুরিয়ে নেড়েচেড়ে তার আস্বাদ বাড়ালে তাকে mulled wine বলে।

এই শব্দটি চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। একটা কাঁচা আন্‌কোরা ভাবকে মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে নানান চিন্তার রসে সিক্ত করে নেওয়া অর্থে এখানে শব্দটির ব্যবহার হয়। তরুণ বয়সে চিন্তাকে mull করার খুব বেশি সময় থাকে না; সেটি সম্ভব হয় কালের সঙ্গে। বিধাতা সে কাল দেননি সুকুমারকে। তাঁর প্রবন্ধগুলি কাঁচা বয়সে লেখা, কোথাও কোথাও অনভিজ্ঞতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া

অসম্ভব নয়। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তীরের মতো সোজা ভাবে আলোচ্য বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা দেখে যেমন আশ্চর্য লাগে, তেমনি বিস্ময় বোধ হয় অবাস্তব বিষয়-বস্তুকে বিশ্লেষণ করার মেধা দেখে।

বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষণা করছেন আলোকচিত্র আর ছবি ছাপা নিয়ে; এদিকে লিখছেন 'ভাষার অত্যাচার' সম্পর্কে প্রবন্ধ, পাকা ভাষাবিদের মতো। অবশ্য ভাষার রহস্য নিয়ে সর্বদাই তিনি বিস্ময় বোধ করতেন। অনেক হাল্কা কবিতাতেও এই চিন্তা প্রকাশ পায়। বর্তমান প্রবন্ধে লিখেছেন,

'কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সূত্রান্বেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এত বড় আজগুবী কাণ্ড বুঝি আর নাই। গাধা শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল।······অথচ (এর) কোনো ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না;···নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই।'

অর্থাৎ এই যে একেকটা নাম বলতে একেকটি বিষয়বস্তু বা প্রাণী বা ভাব আমরা বুঝি, এটা একটা যুক্তিহীন অভ্যাস ছাড়া আর কিছু বলে এখনো কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এই রকম ব্যবহারিক অর্থ স্থলবিশেষে একটু-আধটু বদলাতে বাধ্য। একই শব্দে একজন যা বোঝে, আরেকজন তা নাও বুঝতে পারে এবং এককালে যা বোঝায় অন্যকালে তা নাও বোঝাতে পারে। প্রবন্ধের শেষের দিকে সুকুমার লিখছেন, 'ভাষা যে নিজের অর্থ-গৌরবেই সত্য, এ কথা ভুলিয়া, সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনো দিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না।

সেই জন্যই একেকটা সত্যকে পঞ্চাশ বার পঞ্চাশ রকম ভাষায় পঞ্চাশ দিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে।

ব্রাউনিংয়ের সেই বিখ্যাত লাইনগুলির কথা মনে পড়ে,

"Thoughts hardly to be packed
Into a marrow act,
Fancies that broke through language and escaped."

বিবিধ প্রবন্ধের বিষয়গুলি চিন্তা করলেই সুকুমারের চিন্তাধারা অনেকখানি জানা যায়। 'চিরন্তন প্রশ্ন', 'দৈবেন দেয়ম্', 'শিল্পে অত্যুক্তি', 'ফটোগ্রাফ,' 'ভারতীয় চিত্রশিল্প'।

'The Burden of the Common Man,' 'The Spirit of Rabindranath Tagore.'

চিরন্তন প্রশ্ন হল, আমি কে? আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য? তার উত্তরে সুকুমার বলেছেন, 'আমি এই দেহ নই, এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পরা নই। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে—

কেবল সেই আমিও আমি নই। এই সকল যাহার ছায়া, আমি সেই সত্যবস্তু। আমার জীবন-স্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান; আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি; আমার জীবনের মূলগত সুখদুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি।

সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা।'

দৈবেন দেয়ম-এ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অদৃষ্টবাদের কথা বলেছেন, "অদৃষ্ট কথাটির একটা ইতিহাস আছে। কার্যকারণের কতকটা শৃঙ্খল বেশ দেখা যায়, বোঝা যায়, তাহা দৃষ্ট। আর যাহা স্পষ্ট দেখা যায় না, যাহার হিসাব পাওয়া যায় না, তাহা অদৃষ্ট। সহজ তত্ত্বের এই সহজ সংস্কৃত পরিভাষা।"

বৈজ্ঞানিক দৈববাদীদের কথা লিখছেন, "এই মুহূর্তে জড়জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্বমুহূর্তে অকাট্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্বমুহূর্তের কারণসমষ্টি, যাহা এই মুহূর্তের কারণসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব সময় হইতে অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল।......"

বিজ্ঞান কোথায় পঙ্গু, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন না ঘটাতে পারলে, ব্যর্থতা কি করে এসে পড়ে সে বিষয়ও এই লেখক সচেতন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এ প্রবন্ধ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা এবং এই দীর্ঘ ব্যবধানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দূরত্ব কমেছে। এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই।

"সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে এবং কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমস্ত খণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্তে এই প্রবাহের নিত্যতাকে রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখনো জিজ্ঞাসু হইয়া, তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারি মধ্যে বিজ্ঞানের সকল সাধনা সকল অন্বেষণের সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণসম্পন্ন একটা অকাট্য প্রেরণাশক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও, বিজ্ঞান এই জ্ঞান বস্তুটাকে কোথাও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। কারণ বিজ্ঞান তো চৈতন্যকে খুজিতে আসে নাই, সে শক্তির

নিয়মকেই খুঁজিয়াছে এবং সেই জন্যই পদে পদেই জীবন্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে।”

এইরূপ স্থির গম্ভীর প্রত্যয়ের উপর সুকুমারের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অসম্ভব এবং উদ্ভট নিয়ে তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না তো করবে কে? সার্কাসের সংদের দেখা যায় তালিমারা রং-চং পোশাক পরে ঢং করে কি আশ্চর্য ভারসাম্যের কারসাজি দেখাচ্ছে। ওস্তাদ যদি তাঁবুর চূড়ো থেকে লাফিয়ে দোলনা ধরে দোল খেয়ে নিচে নামেন তো জাব্বাজোব্বা পরা ন্যাকা সং মাধ্যাকর্ষণের বিপক্ষে প্রবল সাক্ষ্য দিয়ে, নিচে থেকে লাফ মেরে দোলনা ধরে, চক্ষের নিমেষে তাঁবুর ছাদের মগডালে চড়ে বসে হি-হি করে হাসে।

বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেই কথাই অবনীন্দ্রনাথও অনেক পরে তাঁর বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালায় বলেছিলেন।

“প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করাই যদি শিল্পী মনে করেন যথেষ্ট হইল, তবে অনেক স্থলেই তাঁর বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেটুকুই তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে ঠিক বলা হইল না।”

সুকুমার আরো বেশি বলেছেন, “শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহার সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন এবং নেচার হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলি আবশ্যকমতো গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে।”

নিজে ফটোগ্রাফ-বিশারদ, ফটোগ্রাফি সম্পর্কে লিখেছেন, —“ফটোগ্রাফ জিনিসটাকে সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। কিন্তু অনুসন্ধান

করিতে গেলে দেখা যায় যে সত্যের বিকৃতিসাধনেও ফটোগ্রাফ বড় কম পটু নয়। তাছাড়া তার ছোট-বড় জ্ঞানশূন্য নির্বিকার দৃষ্টিতে মুড়িমুড়কি এক দর হইয়া যে অসঙ্গতি ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নহে।"

এখানে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। শিল্পীর অনেকখানি শিল্পগুণ তার চোখে, এই চোখের গুণটি না থাকলে ফটোগ্রাফার কখনো শিল্পীর সম্মান পায় না। কাকে রাখা হবে, কাকে বর্জন করা হবে, কোন্ কোণা থেকে কাকে দেখা হবে, কতখানি দেখা হবে, কিভাবে সেই দেখা জিনিসটির উপর কতখানি আলো ফেলা হবে,—শিল্পজ্ঞান না থাকলে, চোখ দুরস্ত না হলে, তাই বা কি করে বোঝা যাবে।

শিল্প সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই শিল্পীর আঁকা কুমড়ো-পটাশ বা ট্যাঁশগরুর ছবি বিচার করতে গেলে বড় মজা হয়। প্রাকৃতিক জগতের দৃষ্ট বস্তুর শরীর থেকে কিছু নিয়ে, কিছু বর্জন করে, কিছু অতিরঞ্জন করে, শিল্পী তাঁর মনের চোখ দিয়ে দেখা ছবি খাড়া করেছেন সন্দেহ নেই। এই বড় আশ্চর্য কথা যে পাকা শিল্পী হয়েও, সুকুমার ছবিকে কখনো লেখার চেয়ে বড় হতে দেননি। এগুলি ছবি নিয়ে লেখা নয়, লেখায় বর্ণিত বস্তুকে প্রকট করার জন্যই ছবি। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে ছবিকে বাগ মানানো যায়নি ; লেখায় যা বলা হয়নি, ছবি সেটি বলে বসে আছে। সেটি হল, আবোল-তাবোলের 'চোর ধরা'তে, একথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

॥ সতেরো ॥

যে বিশেষ ক্ষেত্রে সুকুমারের সব চাইতে বেশি সম্ভাবনা ছিল, সেখানেই তাঁর হাত পাকার কাজ সবচেয়ে কম এগিয়েছিল। যেখানে তিনি অদ্বিতীয়, সেখানেই তাঁর সৃষ্টি সব চাইতে কাঁচা থেকে গেছে। এ কি করে সম্ভব হল, সেটা বুঝতে হলে বাংলা নাটক সম্বন্ধে একটু ভাবতে হয়। এই বড় দুঃখের কথা যে বাংলা সাহিত্য, অন্য সব দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ হলেও, নাটকের ক্ষেত্রে সে তুলনায় অতিশয় দুর্বল। এখনো স্কুল-কলেজের উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছিল চুয়ান্ন বছর আগে আর রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গেছে।

এমনও নয় যে এখনকার লেখকদের নাটকীয় প্রতিভা নেই। যাঁরা এত উৎকৃষ্ট ছোট গল্প রচনা করেন যা পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তাঁরা যুগান্তকারী নাটক রচনা করেন না কেন বোঝা যায় না। ইদানীং কয়েকজন গুণী নাট্যকারের কথা শোনা গেছে, কিন্তু হয় কোনো সাময়িক আন্দোলনের, নয় তো চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে, যার মধ্যে স্থায়ী আবেদনের সম্ভাবনা নেই। তবে দু-একজন যে ভাল নাটকও লিখেছেন এবং সেসব মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের প্রীত করেছে, এ কথাও মানতে হবে।

এক্ষেত্রে অনেক প্রতিভা নিয়েও সুকুমার মাত্র সাতটি নাটিকা রেখে গেছেন। পড়ে মনে হয় সাতটি সাত রকমের এক্সপেরিমেণ্ট। এসব নাটক জনসাধারণের জন্য লেখা হয়নি, একটিও আসর জমাবার জন্য রচিত প্রকৃত নাটকীয় পরীক্ষা নয়। ছোটবেলায় বাড়িতে ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবরা জন্মদিন ও অন্যান্য পারিবারিক উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয় করত, অনেক সময়ই নাটকটি তাদের বড়দা

লিখে দিতেন। প্রধান ভূমিকায় অনেক সময় তিনি অভিনয়ও করতেন। এসব নাটিকা লেখার সময় সর্বদা নিজেদের সীমিত উপকরণ ও অপটু অভিনেতার কথা লেখকের মনে থাকত। এভাবে তো আর সত্যিকার নাটক রচনা হয় না। অভিনেতার জন্য তো আর নাটক নয়, নাটকের জন্য অভিনেতা প্রস্তুত করা চাই। তা ছাড়া বাংলার একটা বড় অভাব দূর করার উদ্দেশ্য, অন্ততঃ সচেতনভাবে সুকুমারের আদৌ ছিল না, তিনি শুধু সকলকে নিয়ে একটু উঁচুদরের মজা করতে চাইতেন। এসব অভিনয়ে দর্শকের সংখ্যা খুব কমই থাকত, জনসাধারণ জানতেও পারত না। তাছাড় পূর্ণাঙ্গ নাটক একটিও নয়, ছোট ছোট একাঙ্ক নাটিকা মাত্র, হয়তো চার-পাঁচটি দৃশ্যেই সমাপ্ত।

সাতটি নাটিকার মধ্যে হিংসুটে ও অবাক জলপান সন্দেশে প্রকাশিত ছোটদের নাটিকা। হিংসুটের চরিত্রগুলি ছেলেমানুষ হলেও, অবাক জলপানের পাত্ররা সাবালক। সুকুমার জানতেন ছোটদের নাটক মানে নয় যে পাত্রপাত্রীদেরো নাবালক হতে হবে। হিংসুটেতে একটিও ছেলের ভূমিকা নেই, অবাক জলপানে মেয়ে নেই। প্রথমটা হয়তো মেয়েদের ও দ্বিতীয়টা ছেলেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য রচিত। হয়তো মেয়েদের ছেলে সাজা ও ছেলেদের মেয়ে সাজা তিনি পছন্দ করতেন না। 'ঝালাপালা' আর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বছর কুড়ি বয়সে লেখা। 'ভাবুক সভা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, প্রবাসীতে। সুকুমার তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন, রচনাকাল সম্ভবতঃ আরো আগে। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'ও সম্ভবতঃ ঐ একই সময়ের লেখা ; 'চলচিত্তচঞ্চরি'ও আগে রচিত ও অনেক পরে, ১৯২৭ সালে, বিচিত্রায় প্রকাশিত। সুকুমার তখন ইহলোকে নেই।

জন্মদিন ইত্যাদি ছাড়াও বাড়িতে নানান উৎসব হত। প্রথমে ননসেন্স ক্লাব ছিল, তারপর বিলেত থেকে ফিরে মণ্ডে ক্লাব হল।

হাসির নাটক ছাড়া চলে কি করে? হাসির ব্যাপারও হবে, আবার হাতের গোড়ায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাঁদের দ্বারা যাতে সহজে অভিনীত হতে পারে, এমনও হওয়া চাই। তাছাড়া একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার, নাটকমাত্রেরি মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা থাকা চাই, নইলে নাটক হয় না। শুধু লেখা নাটক বলে কিছু নেই। অন্ততঃ আর যাই হোক, সেটি নাটক নয়।

আসলে ভালো অভিনেতা, ভালো গাইয়ের খুব অভাব ছিল না। আর উৎসাহী দর্শকরা তো ঘরে ঢুকবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হত, অনুমতিরো অপেক্ষা করত না। সিন-সিনারির বালাই ছিল না। যাত্রার পালার দেশ আমাদের, ওসব দিয়ে কি হবে? দরকারমতো টুল, চৌকি, ছবি, পর্দা, শাড়ি, ফুলের টব, গন্ধমাদন পর্বতের জন্য ডালপালা গোঁজা ধোপার পুঁটলি। এসব তো লোকের বাড়িতে-ই পাওয়া যায়। ন্যাকড়া দিয়ে ল্যাজ পাকাতেই বা কতটুকু সময় লাগে, আর সামান্য খরচে দোকান থেকে জটা, দাড়ি, আর বাঁদুরে মুখের জন্য ক্রেয়ন পেনসিল আনা। ব্যস, আর কি চাই? সেক্সপীয়রেরো অনেক নাটক এর চাইতেও কম উপকরণে সরাই খানার উঠোনে অভিনীত হত।

তফাৎ এই যে সে-সব ছিল পেশাদারী নাটক, মাইনে করা অভিনেতা, কিঞ্চিৎ অর্থ ও সম্ভব হলে যৎকিঞ্চিৎ রাজানুগ্রহ-লাভ ছিল তাদের অভিপ্রায়। সে যাই হোক, প্রধান উদ্দেশ্য সকলেরি এক কথা, দর্শকদের মনোরঞ্জন করা। সুকুমারের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যটা আরো ব্যাপক ছিল। কারণ শুধু দর্শকদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে নাটকটির অভিনেতাদেরো উপভোগ্য হওয়ার দরকার ছিল। অবশ্য দর্শকরা যেমন প্রাণ খুলে হেসে গড়াতে পারত, অভিনেতাদের তেমনি মুখ গম্ভীর করে অদ্ভুত সংলাপ পরিবেশণ করতে হত, অদ্ভুত গান গাইতে হত। তাদের হাসবার সুযোগ দেওয়া হত না; আগাগোড়া একটা মক্ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ নকল গাম্ভীর্য রক্ষা

করে যেতে হত। তার জন্য অশেষ সংযমের দরকার হত। সুকুমারও কড়া প্রযোজক ছিলেন।

নাটককে লোকে বলে জীবনের অংশ, অর্থাৎ অল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের সুখদুঃখ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বিচিত্র মানবচরিত্র দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা রঙ্গমঞ্চেই সম্ভব হয়। তবে সব নাটকেই তো আর সব দিক দেখানো যায় না, বেছে নিতে হয়। সেকালে শ্লেষাত্মক নাটকে জীবনের প্রায় অপর সব দিককে উপেক্ষা করে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনার্থে কেবলমাত্র দর্শনীয় বিষয়টুকুর অতিশয়োক্তি করে, দর্শকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হত। সামাজিক কুসংস্কারাদি দূর করবার জন্য এই ধরনের এক-তরফা নাটক মঞ্চস্থ করা হত। তাছাড়া ঐতিহাসিক নাটক ছিল। বিদেশী নাটকের অনুবাদ ছিল। স্বদেশ-প্রেমের নাটকও ছিল, তবে সেসব প্রায়ই সরকার বন্ধ করে দিতেন। ফ্যান্টাসিও কিছু ছিল, আর ছিল প্রহসন ও হাসির নাটক। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন অনাবিল হাসির ব্যবস্থা ছিল কিনা সন্দেহ। তবে এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে সুকুমারের কোন কোন দৃশ্যে মাঝে মাঝে কবিগুরুর 'গোড়ায়-গলদ' বা 'বিনিপয়সার ভোজের' সংলাপ একটু একটু মনে পড়ে বটে, কিন্তু উদ্ভটতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বেশিদূর অগ্রসর হবার কখনো চেষ্টাও করেননি। এক ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ছাড়া।

'হিংসুটে' নাটক স্কুলের মেয়েদের জন্য লেখা। সাতটি পাত্রী দেখানো হয়েছে; পাঁচটি ছোট মেয়ে, বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে বেশির ভাগই দারুণ হিংসুটি; স্বপ্নবুড়ি আর হিংসা। একটিমাত্র দৃশ্য এবং সহজেই অনুমান করা যায় মিনিট পনেরো অভিনয়কালের মধ্যেই যার যার হিংসার ব্যামো একেবারে আরাম হল। নাটকটি প্রচলিত ফ্যান্টাসির নিয়ম-ঘেঁষা এবং একটি অতুলনীয় গান ছাড়া সুকুমারের স্বকীয়তা বড় একটা চোখে পড়ে না। গানটি অবশ্য অদ্বিতীয়।

একটু শোনাই ঃ—

"আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিস্‌রি।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম।"
ইত্যাদি।

এই সঙ্গে অবাক জলপানের বিষয়ও বলতে হয়! এর রস অন্য রকম, অনেক বেশি সচেতন ও পরিপক্ক। এখানে 'খাই-খাই' শ্রেণীর কথার খেলা দেখা যায়। স্থানে স্থানে এই রস চূড়ান্তে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাষা এত সহজ সরস যে ছোটদেরো সে সংলাপ অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

গল্পাংশ যৎসামান্য ; একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের জল পাবার বৃথা চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত চাতুরি অবলম্বনে কৃতকার্য হওয়া। এই ক্ষুদ্র পরিসরেও সুকুমারের একান্ত স্বকীয় চমৎকারিত্ব প্রকট : একটু নমুনা দেখা যাক।

পথিক—মশাই একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

আগন্তুক—জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি—

পথিক—না, না, আমি তা বলি নি—

আগন্তুক—না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক—না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে—

আগন্তুক—চাচ্ছেন না তো কোথায় পাব কোথায় পাব কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক—আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম।

আগন্তুক—জল চাচ্ছেন তো জল বললেই হয়—জলপাই বলবার কি দরকার ছিল ? জল আর জলপাই কি এক হল ? আলু আর আলুবখরা কি সমান? মাছও যা, মাছরাঙাও তাই ? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন ? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন ?

তারপর এক কবির সঙ্গে দেখা।

পথিক—মশাই আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে কোথাও ?

কবি—কি বলছেন ? জল মিলবে না ? খুব মিলবে।···জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি ? কাজল—সজল—উজ্জ্বল—জ্বলজ্বল—চঞ্চল চলচল, আঁখিজল ছলছল, নদীজল কলকল, হাসি শুনি খলখল, অ্যাকানল ব্যাকানল, আগল ছাগল পাগল, কত চান ?

এ কথা যদি কেউ মনে করেন যে হাল্কা হাসির সুরে লেখা সুকুমারের নাটকগুলির কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্ভাবনা নেই, তা হলে তিনি ভুল করবেন। কোনো কোনো সমালোচকের দুটি অভিযোগ ছিল। প্রথম, এসব নাটক পড়ে ছেলেরা জ্যাঠামি শিখবে। দ্বিতীয়, ঠাকুরদেবতা বা রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করা উচিত নয়।

মজার কথাবার্তা ও চটাং-চটাং বুলি শুনলেই যদি ছোটরা জ্যাঠামি শেখে, তাহলে অকালপক্বতার হাত থেকে কেউ তাদের উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ, সমস্ত সাহিত্যজগৎ, মায় রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত ওদের তাই শেখাবে। সুকুমারের হাসিঠাট্টা সর্বদা সুস্থ প্রকৃতির ও নির্মল, তাতে কোনো ছোট ছেলের অনিষ্ট হবে না। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে এইটুকু বলা চলে যে শিল্প বা রসসৃষ্টির জগতে ছোট বড় পাত্রাপাত্র ভেদ নেই এবং যতক্ষণ না কোনো অশালীনতা দেখা যাচ্ছে আপত্তিরো কোনো কারণ নেই। রসিকজন রসকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দানও করেন, গ্রহণও করেন, এখানে

'পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে কেন ঠাট্টা হচ্ছে' বললে চলে না। আর সত্যি কথা বলতে কি, পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যেই ঠাকুরদেবতা নিয়ে যথেষ্ট রস জমানো হয়েছে। স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে জগতে অনেক রসিকতা হয়ে গিয়েছে, তাতে তাঁর মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তাছাড়া সুকুমার রায়ের নাটকের জ্যাঠামিগুলিও এমনি বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভরা এবং কোনো চরিত্রকেই হীন প্রতিপন্ন করার যখন কোনো চেষ্টাই নেই, শুধু মজাটুকু দেখানোই উদ্দেশ্য, তখন নিতান্ত বে-রসিক ছাড়া কারো কাছে এগুলিকে আপত্তিকর বলে মনে হবে বলে মনে হয় না। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' যখনি অভিনীত হয়েছে, ছেলেবুড়ো হেসে কুটিকুটি হয়েছে ; এমন অনাবিল হাসির উৎসে যারা পঙ্কিলতা দেখে, পঙ্কিলতা তাদের চোখে।

॥ আঠারো ॥

ভাবুক সভা আগাগোড়া কাব্যে লেখা। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ ভাবুক সভা পড়ে সুকুমারকে হেসে বলেছিলেন, এ তুমি নিশ্চয় আমাকে মনে করে লিখেছ! এই নাটকের রস ছোটদের বোধগম্য হবে বলে মনে হয় না। একে ঠিক নাটক-ও বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ ঘটনার পারম্পর্য কাউকে কোনো অপরিহার্য পরিণামে পোঁছে দিচ্ছে না।

ঘটনাই নেই, তার আবার পারম্পর্য। বরং পাত্রদিগকে দুদিন উপোস করিয়ে রাখলেই পরিণাম পরিহার করা যায়। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। বলা বাহুল্য দৃশ্য বা দৃশ্যপটের বালাই নেই।

১ম দৃশ্যে ভাবুকদাদা হয় নিদ্রিত, নয় সমাধিস্থ, নয় মূর্ছা, নয় ফিট্। চ্যালাদের প্রবেশ।

১ম চ্যালা— ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা ?
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !

*　　*　　*

২য়　ভাবটা যখন গাঢ় হয় বলে গেছেন ভক্ত,
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত !
১ম　যখন ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পলায় দেহ ছেড়ে !
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি, শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি !
যেমনধারা পড়ছে দেখ গুরু গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাকো বিশ্বাস !
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু—
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

(সবাই মিলে তারস্বরে বিলাপ-সঙ্গীত)

*　　*　　*

"ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বসে তায়,
ভাব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়—"

(চেঁচামেচির চোটে ভাবুকদাদার নিদ্রাভঙ্গ)

ভাবুকদাদা—জুতিয়ে সব করব সিধে, বলে রাখছি পষ্ট !
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটা করলি নষ্ট !

(চ্যালারা অবাক)

ঘুম কি হে ? সি কি কথা ? অবাক করলে খুব !
ঘুমোও নি তো, ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব !

ভাবুকদাদা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপ্রস্তুতের একশেষ।

'সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে, দেখছি ভবের রং !
মহিষ যেমন পড়েরে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।'

পূর্বেই বলা হয়েছে ঘটনাই নেই, তার আবার বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে ? ভাবের নামতা দিয়ে কার্যে ইতি।

"ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুনে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপসিয়া, ঢেকুর উঠবে চোঁয়া।
চার ভাবে চতুর্ভুজ, ভাবের গাছে চড়,
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও, গাছের থেকে পড় !"

নির্মল নির্ভেজাল রসের উৎসব। পরোক্ষভাবে যদি কারো উপর কটাক্ষ থাকে তা, সে শুধু ভণ্ড ভাবুকদের উপর। তাতে আশা করা যায় কেউ কিছু মনে করবে না, কারণ মনে করার আগে নিজেকে ভণ্ড ভাবুক বলে স্বীকার করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে সাতটি নাটক সাত রকমের। 'ঝালাপালা' কাঁচা হাতের রচনা, গল্পাংশে কিঞ্চিৎ অপরিপক্কতা, যেমন কবিগুরুর 'গোড়ায়-গলদে'ও দেখা যায়। প্লটে খুব একটা অভিনবত্ব না থাকলেও, সংলাপের তুলনা হয় না। স্বচ্ছন্দে বলা চলে কথাবার্তা যতই আজগুবী হোক, পরিস্থিতিটি বাস্তবধর্মী ; সেকালে এরকম ব্যবস্থা হরদম ঘটত।

ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু বড় বেশি ভালোমানুষ। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে স্বার্থান্বেষী মোসাহেবের ভিড়, তাদের তাড়ানো তাঁর কর্ম নয়। তাঁর চাকর রামকানাই হয়তো পারত, কিন্তু মুনিবের হুকুমে অসভ্যতা করা বন্ধ, কাজেই তারও হাত-পা বাঁধা ! তবু সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্থায়ী মোসাহেবরা ছাড়াও, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওস্তাদ কেবলচাঁদ জুটেছেন। উপরন্তু পণ্ডিত মশাই স-ছাত্র টোলটিকে জমিদারবাড়িতে উঠিয়ে এনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার তালে আছেন। অগত্যা জমিদারবাবুকে কেদারকেষ্টমামার শরণাপন্ন হতে হল, তিনি রামকানাইকে কনস্টেব্‌ল্ সাজিয়ে স্রেফ ভয় দেখিয়ে নিষ্কর্মার দলটিকে ভাগালেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি মোসাহেবেরা অত সহজে ভাগে না, তাই প্লট খুব জোরালো

হয়নি। আগেই বলা হয়েছে গল্পাংশ কিছুই নয়, রস জমেছে আলাপনে।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মতো নাটক বাংলাভাষায় আজো লেখা হয়নি। নাটক না বলে যাত্রাও বলা চলে; খোলামাঠে অভিনয় হতে পারে। রামায়ণের সেই চেনা গল্প থেকে নিছক হাসির মশলাটুকুকে বের করে নিয়ে, সাজিয়েগুজিয়ে উপস্থিত করা। কাউকে অশ্রদ্ধা করা হয়নি, সবাইকে নিয়ে শুধু একটু মজা করা হয়েছে। রসের রাজ্যে ছোট-বড় মাত্রাজ্ঞান নেই, সত্যমিথ্যা নেই; সেখানে শুধু রসটুকুই সত্য আর বাকি সব তার আধারমাত্র।

ছোট নাটিকা, মাত্র চারটি দৃশ্যেই সমাপ্ত। প্রথম দৃশ্যে বোঝা যাচ্ছে যে যদিও স্বয়ং রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছেন যে রাবণ একটা তালগাছে চড়তে গিয়ে পপাত চ মমার চ, তবু ব্যাটা আসলে মরেনি। লাঠি কাঁধে হতভাগার সশরীরে আগমন আসন্ন জেনে, লক্ষ্মণ সুগ্রীব ইত্যাদি অগ্রসর হলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বীর সেনানী রাবণের জন্য অপেক্ষমাণ। হেন-কালে নেপথ্যে জাম্বুবানের কণ্ঠস্বর—"ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে!" সঙ্গীত—

"যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়,
তবে তুই মরে যাবি, তবে তুই ম-রে-যা-বি!
ওরে পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা!
তা না হলে মরে যাবি" ইত্যাদি

অতঃপর রাবণ সত্যিসত্যি এল ও বিধিমতে সুগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হল। রাবণের লগুড় খেয়ে সুগ্রীবের সে কি বিলাপ!

"ওরে বাবা ই কি লাঠি, গেল বুঝি মাথা ফাটি,
নিরেট গদা ই কি সর্বনেশে!
কাজ নেই রে খোঁচাখুঁচি, ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি,
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে!"

অতঃপর পলায়ন ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ এবং অনতিবিলম্বে শক্তিশেল প্রয়োগ ও লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং তার পকেট সার্চ করণান্তে রাবণের প্রস্থান। লক্ষ্মণের দশা দেখে রামচন্দ্রের শিবিরে গভীর শোক। জাম্বুবান ওষুধের বিধান দিলেন, বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী এই দুই গাছের শিকড় আনতে হবে। হনুমান যাক। কিন্তু হনুমান কি সহজে যেতে চান! 'আমি ডাক্তারখানা চিনি না।' জাম্বুবানও ছাড়েন না, ডাক্তারখানা কিসের, কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পর্বত আছে, সেইখানে যেতে হবে। হনু বললেন—'ও বাবা, সেই কৈলেস পাহাড়? এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।' শেষ অবধি অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করানো গেল।

চতুর্থ দৃশ্যে দুই যমদূত এসেছে বাড়ি চিনে লক্ষ্মণকে নিয়ে যাবে; তা বিভীষণ যখন পাহারায় আছেন, তিনি দেবেন কেন? শেষ অবধি স্বয়ং যমরাজের আগমন। আরেকটু হলেই রামায়ণের গল্পটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়, গাছ চিনতে না পেরে, গোটা গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়ে হনুমানের প্রবেশ এবং রাখবি তো রাখ্, একেবারে যমরাজার উপর! সেই সুযোগে জাম্বুবান লক্ষ্মণকে ঔষধ প্রয়োগ করলেন এবং লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়ালেন। তখন যমরাজার উপর থেকে পর্বত তোলা হল, লক্ষ্মণকে জ্যান্ত দেখে তিনি অবাক! 'সে কি, আপনি তবে বেঁচে আছেন? চিত্রগুপ্ত আমাকে ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখুনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি!'

এমন নাটক বাংলায় কটা আছে?

'চলচিত্তচঞ্চরি' আর 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রচনা; এদের মর্মকথা, বিশেষ করে শেষোক্তটির অতিশয় সূক্ষ্ম, সাধারণের ধারণযোগ্য ঠিক নয়। হয়তো সেই কারণেই যে দেশে এত নাটকের অভাব, সেখানেও এগুলির কথা খুব বেশি লোকে জানেও না, মঞ্চস্থ করার খুব বেশি চেষ্টাও হয় না। এর কোনোটিতেই স্ত্রী চরিত্র নেই। হয়তো সময় থাকলে সুকুমার এই ধারা অবলম্বন করে আরো

অনেকদূর অগ্রসর হতেন ; এখন এটুকুমাত্র বলা চলে এ ধরনের নাটক আগেও কেউ লেখেনি, পরেও না।

ভণ্ডামি, দলাদলি, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি নিয়ে, সমস্ত তিক্ততা বাদ দিয়ে নিছক মজা করা খুব সহজ নয়। সাধারণতঃ একটুখানি শ্লেষ, একটুখানি কটুভাব, হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও, এসে পড়ে। 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে তেমন হয়নি। তরুণ লেখকের অব্যর্থ-সন্ধানী বাক্যগুলি সঙ্গে সঙ্গে কি করে এত সরস হল, তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। গল্পটি এবার শোনা যাক।

সাম্যসিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণের ও শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমচারীগণের মধ্যে দারুণ রেষারেষি, মন-কষাকষি, চোখরাঙানি, তেমন হলে হাতাহাতিতেও বাধা নেই।

দুই পক্ষের মাঝখানে আগন্তুক ভবদুলালবাবু। তিনি একজন জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক, 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাম দিয়ে একখানি বই লিখবেন। তার জন্য উপাদান সংগ্রহ করছেন। যেখানে যে ভালো কথা শোনেন তখুনি নোটবইয়ে টুকে রাখেন। পরে বইতে ঢুকিয়ে দেবেন। বইটা তখনো লেখা না হলেও, তার মলাটের পরিকল্পনা তৈরি, পাঠ্যাংশটুকু যোগাড় হলেই ছাপা হবে।

উভয় শিবিরে ভবদুলালের অসঙ্কোচে যাতায়াত। উভয় পক্ষই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত ; সকলের সহযোগিতা পেয়ে দিনে দিনে নোটবই ভর্তি হতে লাগল। এখন মুশকিল হয়েছে যে ভবদুলালের আগ্রহ যতই থাকুক, স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তি দুটোই কম। কি লিখতে খাতায় কি লেখেন তার ঠিক নেই। একদিন দৈবাৎ সব ফাঁস হয়ে গেল। এমনিতেই এ শিবিরের কথা ও শিবিরে বলে দেওয়াতে উভয় পক্ষই যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল, এবার নোটবই পড়ে সবার চক্ষু চড়কগাছ! তাঁরা তাঁর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে নোটবই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললেন।

কিন্তু দুনিয়ার ভবদুলালরা কি এত সহজে পিছপাও হয়?

কাগজের কুচি যতটা পারলেন কুড়িয়ে নিয়ে বুক ফুলিয়ে ভবদুলাল বললেন, "খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কি হয়েছে? আবার লিখব।... লাল রঙের মলাট, চামড়া দিয়ে বাঁধানো, তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা চলচিত্তচঞ্চরি published by ভবদুলাল! একুশ টাকা দাম করব।"

ভাবুক সভায় অর্থ-অনর্থের বিরোধের উল্লেখ আছে ঃ—

"অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া;
ভাবুকের ভাত মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা!
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
অর্থ অর্থ করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে।
অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম,
অভিধান ঘাঁটা সে কি ভাবুকের কম্ম?

* * *

মাখন-তোলা দুগ্ধ আর লবণহীন খাদ্য,
আর ভাবশূন্য গবেষণা, এ কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ?"

এই চিন্তার বীজটি 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে' অঙ্কুরিত হয়ে, দ্রুমের উদ্ভট আকৃতি গড়েছে। প্লটটি অতিশয় অভিনব। এক গুরুজি আর তাঁর গুটিকতক শিষ্য। তাদের সঙ্গে বিশ্বম্ভর বলে একটা বাইরের লোক এসে জুটেছে। গুরুজির শিক্ষার গোপন মন্ত্রটি তার জানবার বড় ইচ্ছা, এদিকে শিষ্যরা কিছুই প্রকাশ করতে চায় না। বড় জটিল সাধনা; গুরুজি নিজে তার ব্যাখ্যা করলেন। শব্দ নিয়ে সাধনা।

গুরুজি বললেন, "শব্দই আলোক, শব্দই বিশ্ব, শব্দই সৃষ্টি, শব্দই সব।" তিনি শব্দসংহিতা লিখছেন। শব্দকে অর্থ থেকে ছাড়াতে হবে। তিনি বলছেন, "একেকটি শব্দ একেকটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙ্গে চক্রের মুখ খুলে

দাও, তবেই সে মুক্তগতি spiral motion হয়ে, কুণ্ডলীক্রমে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে কি থাকে না। যে সংকেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজ নেই। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সংকেতমন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব শব্দের কি শক্তি। রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেব।"

বাস্তবিক হলও তাই, অমাবস্যার রাত্তিরে সশিষ্য গুরুজি অর্থমুক্ত শব্দের স্পাইরেল ধরে একেবারে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁচেছেন; দেবতাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেছে, এমন সময় চক্রের গতি কমে গেল। কি ব্যাপার? না হতভাগা বিশ্বম্ভর এসে সবার শেষে জুটেছে!

'ও বিশ্বম্ভর, তুমি কি কোনরূপ ভার বহন করে আনছ?' বিশ্বম্ভর বললে, 'আমি ভাবছিলুম—'। 'ভাবছিলে? সর্বনাশ! সর্বনাশ! ভেবো না ভেবো না! শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ? ছিঃ! এমন করে শব্দশক্তি ম্লান কর না।'

হেনকালে বিশ্বকর্মার আবির্ভাব। ব্যস্, স্বর্গযাত্রার ঐখানেই ক্ষান্তি! শব্দ থেকে ছাড়া পেয়ে অর্থগুলো শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বিশ্বকর্মা তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন।

"ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন?
জাগেনি সুপ্ত হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই?
শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দমুখে প্রতিলোম শক্তি এসো ঘিরে,
কুণ্ডলীর মুখে যাও ফিরে।

* * *

শব্দ যবে হবি কুণ্ড অফুরন্ত ধূম!
এই মারি শব্দকল্পদ্রুম!"

ব্যস্, spiralএর গতি শেষ, সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন!

পরিশিষ্ট

চিঠিপত্র

এই সব চিঠি সুকুমার বিলেত যাবার পথে আর বিলেতে থাকতে থাকতে, মাকে, বাবাকে, কাকাকে আর দুই ছোট বোন খুশিকে অর্থাৎ শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে আর টুনিকে অর্থাৎ শ্রীযুক্তা শান্তিলতা চৌধুরীকে লেখা। পুণ্যলতাকে 'ছেলেবেলার দিনগুলি'র রচয়িতা বলে সকলে চেনে। শান্তিলতা নিতান্ত অকালে পরলোক গমন করেন।

চিঠিগুলিতে অনেক বিখ্যাত লোকের কথা আছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ-ই তখনো বিখ্যাত হননি। সব চেয়ে বড় কথা ষাট বছর আগে ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন কি ভাবে কাটাত, তার একটি অনাবিল উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। চিঠিতে বর্ণিত ঘটনার পটভূমিকা স্বরূপ তখনকার বিলেতের সামাজিক চিত্রও ফুটে ওঠে।

যে-সব জিনিস এখন, এমন কি আমাদের দেশেও, দেখে দেখে সকলের চোখে পুরনো হয়ে গিয়েছে, প্রায় ষাট বছর আগে বিলেতেও তার নতুনত্ব ছিল ভাবলে আশ্চর্য লাগে। যেমন, ইলেকট্রিক লিফ্‌ট্‌, রোলার প্রেস, ইত্যাদি।

ঠিকানা, তারিখ ও বৎসরাঙ্ক অনেক চিঠিতে দেওয়া না থাকায় ঘটনার পারম্পর্য সব জায়গায় রক্ষা পায়নি। অনেক চিঠি হারিয়ে গেছে, অনেক চিঠি ব্যক্তিগত কারণে উদ্ধৃত করা যায়নি। তা সত্ত্বেও, ধারাবাহিকভাবে পড়লে এই সব চিঠি থেকেই বাঙ্গালীদের ইতিহাসের একটি পাতা যেন হাতে পাওয়া যায়।

সময়টা ১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগেকার কথা। কিন্তু ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোনো উল্লেখ নেই, ইংল্যাণ্ডের বিষয় যা পাওয়া যায় তা পড়ে মনে হয় তখনো সেখানে সকলে পরম নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছিল।

(১)

এস্ এস্ অ্যারেবিয়া
১১।১০।১১

বাবা,

এখন প্রায় এডেনের কাছাকাছি এসেছি। এ পর্যন্ত sea-sickness হয়নি···। এ কয়দিনে পোষাক পরা, টাই বাঁধা, এসব-ও অনেকটা অভ্যাস হয়ে এসেছে—এখন আর বেশি দেরি হয় না।

স্টুয়ার্ড ক্যাবিনের মধ্যেই খাবার এনে দেয়, কারণ স্টিমারে খাওয়া এত জবড়জং যে আমার ডাইনিং সেলুনে যেতেই ইচ্ছা করে না। মেনু থেকে বেছে দু একটা সহজ ডিস্ আনতে বলি।······ রান্না বেশ চমৎকার।

এ কয়দিন একটুও গরম বোধ করিনি, বরং মোটের উপর একটু ঠাণ্ডাই বোধ হয়। তবে রেড-সীতে গেলে কি হবে জানি না। ······

স্টিমারে উঠবার সময় কোনো রকম মুস্কিল হয়নি। কুক্-এর লোকেই মুটে ডেকে, গাড়ি ঠিক করে, সব বন্দোবস্ত করে দিল। আমি খালি আমার জিনিসগুলো তাদের দেখিয়ে দিলাম। স্টিমারে এসে দেখি সব ঠিকঠাক। ট্রেনে একটু খারাপ লেগেছিল। ···

আমার ক্যাবিনে আর একজন আছে। সে পার্শী, নাম সাবাওয়ালা, বেশ লোক। সেই যে ট্রেনে একজন সাহেব ছিল আমাদের কম্পার্টমেণ্টে, তার-ই নাম সেই কি তোপাগ্লো না কি, সে-ও বেশ মানুষ। সে কন্স্ট্যান্টিনোপ্ল্ যাচ্ছে। রাস্তায় অনেক গল্প-টল্প করল। বোধ হয় বুলগেরিয়ান, কারণ বুলগেরিয়ার অনেক গল্প করল।

তোমরা সব কেমন আছ? আমি বেশ আছি।

স্নেহের তাতা।

(২)

এস্-এস্ অ্যারেবিয়া
১৫। ১০।১১

মা,

……আজ রেড সী পার হয়ে সুয়েজ ক্যানালে ঢুকছি। কাল সকালে বোধ হয় পোর্ট সৈদ পৌঁছব।…সমস্ত দিন ডেকের উপর বসে থাকি, কেবল খাবার সময় নিচে নামি। রাত ৯।১০টা পর্যন্ত ডেকে থাকি। খুব চমৎকার বাতাস।

সঙ্গী অনেক জুটেছে, প্রায় সবাই পার্শী।…খাওয়া দিনে চার বার। সকালে সাতটার সময় চা, সঙ্গে বিস্কুট, রুটি টোস্ট, ফলটল দেয়। ৯টার পর ব্রেকফাস্ট, সূপ থেকে সব। আমার এত… ভালো লাগে না।…১টার সময় লাঞ্চ, মেলা পদ, আমি সামান্য একটু কাটলেট, কখনো বা কেক আইসক্রীম এইসব খাই। রাতে ৭টায় ডিনার। খিদে বেশ আছে, কাজেই খুব খাই।

পথে একটুও গরম বোধ হয়নি…এখন তো বেশ শীত শীত বোধ হচ্ছে। আজ গরম পোষাকটা বের করব।…পোর্ট সৈদ থেকে বিলিতি ডাক অন্য স্টিমারে তুলে দেওয়া হয়।

ক্যাবিনের মধ্যেই ইলেকট্রিক ফ্যান। রাত্রে খুব ঘুমোই।…এক মেমসাহেব আমার কুশনটা চুরি করেছে। ডেক-চেয়ারে রেখে নিচে এসেছিলাম, এর মধ্যে মেমসাহেব সেটাকে বালিশ করে নিয়েছে।

স্নেহের তাতা।

(৩)

২১, ক্রমওয়েল রোড, সাউথ কেনসিংটন
লণ্ডন
বৃহস্পতিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯১১

মা,

……তরশুদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে উঠেছি। বেশ জায়গা,

খাওয়াদাওয়া বন্দোবস্ত সব ভালো। এখানে এখন অনেক বাঙালী ছাত্র আছে, তাছাড়া মুসলমান পাঞ্জাবী এরাও আছে। ডাঃ পি কে রায়দের আপিস-ও এইখানেই। শীতকালটা এখানে থাকতে দেবে। তার পর অন্য বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।······পথে Lyons-এ প্রভাত এক দিন আটকে রেখেছিল। ফ্রান্সে মনে করেছিলাম খুব মুস্কিল হবে, কিন্তু খুব সহজেই সব হয়ে গেল।······স্টেশনের হোটেলে গিয়ে 'তে', চা; লো পোতাব্‌ল্‌, খাবার জল; লিমনাদ, লেমোনেড; প্যাঁ, রুটি; সোকোলা ছ লে, দুধ দিয়ে কোকোর মতো; এই সব চেয়ে খেলাম।

······পথে খুব আমোদে এসেছি। Lyons পর্যন্ত গাড়িতে দুজন ফ্রেঞ্চম্যান ছিল। তারা ইংরিজির কেবল দুটো একটা কথা জানে। তাই দিয়েই হাত মুখ নেড়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।······নামবার সময় খুব হ্যাণ্ডশেক করে গুদ্‌বাই বলে গেল।

ক্যালে থেকে ডোভার পর্যন্ত সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল। ঝড়ের মতো বাতাস।······জাহাজ এত দোলে যে দাঁড়ানো যায় না। সাড়ে তিনটেয় ডোভারে এসে, সাড়ে পাঁচটায় লণ্ডনে পৌঁছলাম। কিনি স্টেশনে এসেছিল।

কাল Penrose-এর আপিসে Gamble সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। খুব ভালো লোক। যে স্কুলে ভরতি হতে হবে, সেখানকার প্রিন্সিপ্যালের কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন। আবার পাছে রাস্তা ভুল করি, সেই জন্য সব এঁকে দেখিয়ে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে ভরতি হয়ে পড়লাম।

স্কুল এখান থেকে ৫।৭ মাইল দূরে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাশের রাস্তা দিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই সাউথ কেনসিংটন স্টেশন। সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নেমে যেতে হয়, কারণ গাড়ির প্ল্যাটফর্ম নিচে, ট্রেন রাস্তার নিচ দিয়ে যায়। যেতে আসতে রোজ্‌ ছয় পেনি লাগে। মান্‌থ্‌লি টিকেট বোধ হয় সস্তা হবে। দু মিনিট অন্তর ট্রেন আসে।···

···একটা গাইড-ম্যাপ কিনেছি······। রাস্তার কোনো সন্দেহ হলে পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেই হল। এখানকার পুলিস অতি চমৎকার। এমন ভদ্র আর এমন পরিষ্কার করে রাস্তাটাস্তা বলে দেয়।······আমার ঘরটা খুব বড়, তিনজন থাকবার মতো।·········চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, আয়না, খাবার জল, হাত ধোবার জল, সব কিছুর বেশ বন্দোবস্ত। ঘর থেকে বেরোলেই স্নানের ঘর, ঠাণ্ডা জল গরম জল।

······আমি বেশ আছি।······

স্নেহের তাতা।

(৪)

২১, ক্রমওয়েল রোড
২৯।১২।১১

মা,

······খ্রীস্টমাসের ছুটিতে এখানে খুব ধুমধাম হল। এ সময়ে পোস্ট-অফিসের কাজ এত বাড়ে যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। চিঠিপত্র গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হয়। খ্রীস্টমাসের দিন আর আগের দিন···এক এক ডাকে আমাদের এখানেই ২০০।৩০০ করে চিঠি এসেছে। মিস্ বেক্···প্রায় ৩০০ কার্ড পেয়েছেন। যে-সব পার্সেল বা চিঠিতে ঠিকানার গোল আছে, সে-সব পোস্ট-অফিসের একটা গুদোমঘরে জমা করে। দুই দিনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঘর তাতে একেবার ভরতি হয়ে গেছে।

পরশু আমাদের এখানে প্রকাণ্ড পার্টি হল। প্রায় ১৫০ লোক এসেছিলেন। কানা-মাছি, টাগ-অফ-ওয়ার, তাছাড়া অনেক রকম খেলা হল। বুড়ো বুড়ো সাহেব মেম পর্যন্ত হুড়োহুড়ি লাফালাফি করছিলেন।

······একটা সুবিধামতো বাড়ি খুঁজছি। লণ্ডনের একটু বাইরে হলেই বোধ হয় সুবিধা। সেখানে অল্প খরচে হয়, তাছাড়া গোলমালও কম।

(৫)

খুসী,

তোর চিঠি পেয়েছিলাম। বোধ হয় উত্তর দেওয়া হয়নি। গত দু'বার মেল ডেতে আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়ম দেখতে বেরিয়েছিলাম।……এখনও এই বাড়িতেই রয়েছি, তবে অন্য বাড়ির খোঁজ-ও করছি। আজকে এক বাড়িতে গিয়েছিলাম, ডাঃ রায় খোঁজ বলে দিয়েছিলেন। সে জায়গাটা মন্দ নয়, আসছে সপ্তাহে ঘর খালি হবে। তবে চার্জটা একটু বেশি বোধ হল। সপ্তাহে ৩০ শিলিং, লাঞ্চ ছাড়া।

খ্রীস্টমাসের ছুটিতে খুব ফুর্তি করা গেল। এক দিন আমরা এক দল মিঃ চেশায়ারকে নিয়ে Hampton Court Palace, Henry VIII-এর বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বেজায় খিদে পেল, অথচ…খ্রীস্টমাস বলে হোটেল-টোটেল সব বন্ধ। আমরা খুঁজে খুঁজে একটা inn বার করলাম। সে-জায়গাটা একেবারে পাড়াগেঁয়ে। সেখানে Roast Beef আর কপি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ দিয়ে খানিকটা রুটি আর চা খাওয়া গেল।

তার পর সমস্ত দিন ঘুরে, সন্ধ্যার কাছাকাছি, Kew Gardens হয়ে, বাড়ি আসা গেল। অনেক দূর, যেতে আসতেই প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। খানিকটা underground, বাকিটুকু electric tram-এ। এখানকার ট্র্যামগুলো দো-তলা।

…আমাদের স্কুলের কাজ বড় সুবিধার চলছে না। Mr. Griggs বলে একজন খুব ভালো lithographic instructor আছেন, তাঁর কাছে private lesson নেবার বন্দোবস্ত করেছি। এর দরুন বোধ হয় সপ্তাহে পাঁচ শিলিং করে দিতে হবে। মোটের উপর দেখছি স্কুলে অতি সামান্যই শেখা যাবে। তবে যে-সব process আগে করিনি, সেগুলো হাতে-কলমে করে বেশ একটা working knowledge হতে পারবে। পরে বড় বড় factory-তে গিয়ে কাজ দেখলে আর-ও সুবিধা হতে পারে।……

দাদা

(৬)

১৯শে জানুয়ারি
১৯১২

টুনি,

……আমাদের এখানে খুব শীত পড়েছে। পরশু রাত্রে খুব বরফ পড়েছিল। সকালে উঠে দেখি সামনের মিউজিয়মের ছাতে কার্নিশের ধারে সব সাদা হয়ে রয়েছে। লণ্ডনের বাইরে অনেক জায়গায় ৭/৮ ইঞ্চি পুরু হয়ে রাস্তায় বরফ জমেছিল।

এর মধ্যে একদিন একটা প্রকাণ্ড ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সাততলা বাড়ি, electric lift-এ চড়ে উপরে উঠলাম। এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড প্রেসে একটা magazine, The Race Horse, ছাপা হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড রোলারের উপর মাইল ২/৩ লম্বা কাগজের roll জড়ানো রয়েছে। সেই কাগজটা এক দিক দিয়ে ঢুকছে, আর এক দিয়ে ছাপানো, ভাঁজ করা আস্ত magazineটা ঝুর-ঝুর করে পড়ছে। ঘড়ি নিয়ে দেখলাম মিনিটে দুশোটা magazine বেরোচ্ছে। ভোঁ-ভোঁ করে এমন একটা ভয়ানক শব্দ হচ্ছে যে কাছে গেলে কান বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

এখানেররান্নাটা এখন আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। Cook কার কাছ থেকে কতকগুলো দেশী রান্না শিখে নিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ডালের বড়া, জিলাপী, খিচুড়ি, এই সব খেতে দেয়। মন্দ লাগে না।……

দাদা

(৭)

২১ ক্রমওয়েল রোড
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১২

মা,

……এখানে মাঘোৎসব হয়ে গেল। শুক্রবার ওয়ালডর্ফ

হোটেলে মস্ত পার্টি হল। প্রায় ২৫০ লোক হয়েছিল। আমি চোগা-চাপকান পরে গিয়েছিলাম। তাই দেখে অনেকে আমাকে পাদ্রি মনে করেছিল। মিঃ মুখার্জির (ডাঃ পি কে রায়ের জামাই-এর) কাছে কেউ কেউ খোঁজ করেছিলেন, 'ইনি কি ব্রাহ্ম প্রচারক?' দুই একজন আমাকেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই বুঝি আজকাল ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কর?' প্রত্যেককে বলে দিতে হল এটা পাদ্রির পোষাক নয়। আমাদের দেশে এরকম পোষাক সাধারণ লোকেও পরে থাকে।

তবে পোষাকটায় একটা সুবিধা হয়েছিল। আসবার সময় ক্লোক-রুমে ওভারকোট রেখে আসতে হয়। তারা একটা টিকেট দেয়। আবার ওভারকোট নেবার সময় টিকেট দেখাতে হয়। আমার টিকেট হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পোষাক দেখে লোকটা বোধ হয় মনে করল, 'এ যখন মিশনারি তখন নিশ্চয় ঠকাবে না।' তাই কিছু গোলমাল করল না। আরেকজনের টিকেট ছিল না, তাকে নাকি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল।

পার্টিতে চা হল। কে-জি গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বললেন। তার পর গান বাজনা হল। তার পর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আর 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' এই গান হল। তার আগের রবিবার মিসেস্ রায়দের ওখানে প্র্যাকটিস্ করা হয়েছিল। আমিও গেয়েছিলাম।

এখানে আর-ও শীত পড়েছে। সোম-মঙ্গলবার পুকুর-টুকুর সব জমতে আরম্ভ করেছিল। বুধবার সকালে খুব বরফ পড়ল। রাস্তা একেবারে সাদা হয়ে গেল। বরফ যে পড়ে, সাদা সাদা তুলোর মতো, খুব হাল্কা। আজ সকাল থেকে অল্প অল্প বরফ পড়ছে।···রাতে যখন ঘুমোই, উপরে কম্বল, নিচে কম্বল। তার উপর আমার একটা কম্বল চাপিয়ে দিই।

সেদিন ওজন হলাম। ২ মণ ১৭ সেরের কিছু উপরে।······

স্নেহের তাতা

(৮)

ম্যাঞ্চেস্টার
বৃহস্পতিবার। ফেব্রুয়ারি

মা,

···দু'দিন হল এখানে এসেছি। এ জায়গাটা লণ্ডনের চেয়ে নোংরা আর ঠাণ্ডাও বেশি। এখানে কয়েক মাস থেকে, আবার লণ্ডনে যাব। আমি এখানে যে-বাড়িতে আছি, সেখানে আরো দুটি বাঙালী থাকেন। একজন হচ্ছেন অপূর্বকৃষ্ণ দত্তর ছেলে আর হৃষীকেশ মুখার্জি বলে একটি ছেলে।······

বাড়িওয়ালী খুব ভালো মানুষ। বয়স ঢের, বোধ হয় ৭০-এর বেশি হবে। বড্ড বেশি কথা বলে। তার নিজের গল্প, মেয়ে-জামাই, ছেলে, নাতি-নাতনি, সকলের গল্প। সুযোগ পেলেই বলতে আরম্ভ করে। তাছাড়া বুড়ির মতটতগুলো চমৎকার।···গোঁড়ামি একেবারেই নেই।

মিস্টার পিয়ার্সন বলে একজন সাহেব, যাঁর কথা আগেও লিখেছি, যিনি ডাঃ পি কে রায়ের জায়গায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন, দিল্লী যাচ্ছেন। বোধ হয় খ্রীস্টমাসের সময় কলকাতায় যাবেন। বেশ বাংলা বলতে পারেন আর মানুষ অতি চমৎকার। যদি আমাদের বাড়ি যান, পাটিসাপ্টা কিম্বা কিছু খাইয়ে দিতে পারলে বড় ভালো হয়। এখানে তাঁর মা থাকেন, বোধ হয় ভাইবোনেরাও কেউ কেউ আছে। তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

স্নেহের তাতা

(৯)

ঠিকানা, তারিখ নেই

মা,

···এর মধ্যে মিসেস্ পিয়ার্সনদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল ডিনার খাবার। সেখানে আরো দু-তিনজন এসেছিলেন, আলাপ হল।

কাল এখানকার (ম্যাঞ্চেস্টারের) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পার্টি ছিল। অনেক লোক হয়েছিল। বেশ গানটান খাওয়া-দাওয়া হল। সকলেই খুব খুশি হলেন। অনেক সাহেব মেম এসেছিলেন।

আমাদের স্কুলের আগেকার প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রেনল্ডের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি আমাদের দেশী ছেলেদের জন্যে অনেক করেছেন। তাদের পড়াশুনা থেকে থাকবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত নিজে করেছেন। এমন কি বিপদের সময় নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বুড়ো মানুষ, ৭০-এর বেশি বয়স হয়েছে। কথা বললে ভক্তি হয়।...তিনি ইউনিটেরিয়ান। বললেন কেশববাবু যখন বিলেতে এসেছিলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। খুব নাকি ভালো লেগেছিল। এখন স্কুল ছেড়েছেন, তবু নতুন কোনো বিদেশী ছেলে এল কি না, তারা কি পড়ে, কেমন থাকে ইত্যাদি অত্যন্ত আগ্রহ করে খোঁজ নেন, এবং তাদের সঙ্গে আলাপ (করেন)।

এখানকার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ইনি মেম্বার। আমি মনে করছি এঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে, ছবিসুদ্ধ Modern Review কিম্বা প্রবাসীর জন্য পাঠাব।...

(১০)

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯১২
ম্যাঞ্চেস্টার

খুসী,

...পরশু, মঙ্গলবার, এখানে Shrove Tuesday ছিল। সেদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে আর ছেলেদের procession ইত্যাদি বেরোয়। সেদিন ছেলেদের সাত খুন মাপ। তারা সং সেজে রাস্তায় বেরিয়ে বিনা ভাড়ায় জোর করে ট্র্যামে ওঠে। যার তার

মোটর গাড়িতে চড়ে বসে। দল বেঁধে theatre pantomime দেখতে যায় আর সেখানে গোলমাল করে।

দুপুর বেলা ছেলেগুলো সব নানা রকম সাজ করে Owens College থেকে procession করে বেরোল। একটা মোটরকারে প্রায় ১২।১৪টা ছেলে চড়েছে। একটা ছেলে maid সেজে গাড়ির ছাতে পিছন দিকে মুখ করে, পা ঝুলিয়ে বসেছে। আর তার পেছনে অত্যন্ত disreputable গোছের চেহারা করে এক দল ঘণ্টা ক্যানেস্তারা ইত্যাদি নিয়ে band বেরিয়েছে। Maidটি একটা ঝাঁটা হাতে করে band conduct করছে।

কয়েকজন suffragette সেজেছে, হাতুড়ি হাতে, 'Votes for Women,' ফ্ল্যাগ উড়িয়ে।……মনে করেছিলাম কিছু ফটো তুলব, কিন্তু এমনি বৃষ্টি নামল যে procession-এর সঙ্গে যাওয়া হল না। বাড়ি পালিয়ে এলাম।

আমি বাড়ি আসতেই আমাদের ৭০ বছরের বুড়ি বাড়িওয়ালী সব জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তাকে procession-এর গল্প বলতে লাগলাম। সে তো লুটোপুটি খেয়ে হাসতে লাগল।

এখানে ৬।৭ জন বাঙালী। আমাদের বাড়িতেই আমরা ৩ জন… এদের মধ্যে হৃষীকেশ মুখার্জী বলে একটি ছেলে…তার সঙ্গে বিশেষ আলাপ, বেশ ছেলে। মনটন বেশ ভালো, তবে মাঝে মাঝে একটু ছেলে-মানুষি করে।

…সেদিন আমার বিছানায় বুরুষ, চিরুনি, basin, soap-dish ইত্যাদি রেখে দিয়েছিল, আর apple-pie bed করে দিয়েছিল। অর্থাৎ বিছানার চাদর আর কম্বল মুড়ে এমনি করে দেয় যে শুয়ে পা মেলা যায় না।

আমিও ভোর রাত্রে উঠে তার ঘরের বাইরে তালা মেরে এসেছিলাম। সকাল বেলা maid গিয়ে বুড়িকে বলছে, 'Mr. Mukherjee has been locked in by Mr. Ray.'

বুড়ি তো শুনে হেসে fit হবার উপক্রম। 'Oh the boys ! Oh the dear boys !' বলে একবার এপাশে একবার ওপাশে ঢলে পড়ছে ! সে হাসি একটা দেখবার জিনিস।……

দাদা

(১১)

১২ থর্ণক্লিফ গ্রোভ
হুইটওয়ার্থ পার্ক ম্যাঞ্চেস্টার
১৪।১১।১২

খুসী

…৩।৪ সপ্তাহ হল ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছি। এখানে School of Technologyতে special student হয়ে ভরতি হয়েছি। Lecture course কিছু নিইনি।…Chromolithographyর evening classএ litho drawing প্র্যাকটিস্ করি। মোটের উপর এখানে খুব ভালোই চলছে। সকালে উঠে স্কুলে দৌড়নোই যা একটু হাঙ্গামা। কারণ ৯।টার সময় স্কুল।

স্কুলটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—৬ তলা বাড়ি। Electric liftএ করে উপরে উঠতে হয়। প্রায় ২০।২৫ জন Indian ছেলে এখানে পড়ে। অধিকাংশই textile, না হয় engineering।

…এখানে লণ্ডনের চেয়ে বেশি শীত।…এখানকার উচ্চারণেও লণ্ডনের চেয়ে তফাৎ। লণ্ডনের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে 'এ' কে 'আই' এর মতো উচ্চারণ করে। যেমন Headache-কে বলবে আই-ডাইক ! রাস্তায় newsboyরা হাঁকে 'পাইপার !' (Paper) 'ডাইলি মাইল !' (Dailymail) এখানে 'এ'গুলো সব 'অ্যা,' 'অ্যা'গুলো 'আ' যেমন মানচেস্টার, হাণ্ড্ল্। Monday, come হচ্ছে মোণ্ডে, কোম। প্রথমটা ভারি গোলমাল লাগে। তার পর দু-এক দিন শুনলেই অভ্যাস হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে আর একজন ছাত্র কাজ করে। সে জাপানী, তার নাম Muraoka। দেখতে বোকা, ভালোমানুষ, কিন্তু ভারি দুষ্টু। সেদিন ডার্করুমে কাজ করছি, আমায় এসে বলছে, 'মিস্তার রায়, এখনি একটা ভারি মজা হবে।' আমি তখন-ও কিছু বুঝিনি। ···একটু পরেই Mr. Fishenden (মাস্টার) এসে যেই ডার্করুমের কল খুলতে গেছেন, অমনি তাঁর নাকেমুখে জল লেগেছে। কলের rubber nozzleটা ঠিক সামনে করে রাখা ছিল। জাপানী অমনি তাড়াতাড়ি বলছে, 'ইভনিন স্তুদেন্ত', অর্থাৎ evening studentদের কেউ ওটা করেছে। জাপানীরা 'ল' বলতে পারে না। এমন কি লিখতে গেলেও অনেক সময় corresponding লিখতে······colleshpond-ing লেখে।

আমার জন্মদিনে এখানে ৬ জন বাঙালীকে নেমন্তন্ন করেছিলাম supper-এ। চা, কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট, ফল, এই সব ছিল।

দাদা

(১২)

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২
লণ্ডন

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।··········লিখেছ বাবার মাঝে মাঝে লিভারের বেদনা হয়। নীলরতনবাবুকে বলা হয়েছে কি ? উনি কি বললেন ? কাজকর্মের দরুণ বাবার শরীর যদি আবার খারাপ হয়, তাই ভাবি।

এখানে আজকাল মিসেস্ পি. কে. রায়দের ট্যাব্লোর ধূম পড়েছে। প্রায়ই উপরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে অ্যাকটিং হয়। আমার উপর ভার দিয়েছেন দেবতাদের কার কি রকম রং, কি রকম অস্ত্র, পোষাক, এই সব খোঁজ করতে। মিউজিয়ম থেকে অনেক খবর

সংগ্রহ করে দিয়েছি। এটা মিসেস্ রায়দের বিলাতে মেয়ে পাঠাবার জন্যে যে স্কলারশিপ আছে, তার জন্যে হচ্ছে। কেবল মেয়েরা মিলে করছেন। টিকিট করা হচ্ছে।

গত রবিবার মিসেস্ রায়দের বাড়ি লুচি, ছোলার ডাল, (তোমার ডাল) চিংড়িমাছের ডালনা, মোহনভোগ, এই সব খেলাম। খুব চমৎকার হয়েছিল।.........

এখানে শীত অনেকটা কমেছে। কিন্তু সকলে বলছেন এত তাড়াতাড়ি কমে যাওয়ার মানে শীত এখনও শেষ হয়নি আবার ফিরে আসবে।

স্নেহের
তাতা

(১৩)

২৭এ ফেব্রুয়ারি
ম্যাঞ্চেস্টার

মা,

আজ সে-বাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন বাড়িতে এসেছি। আমরা মানে বাড়িওয়ালী পর্যন্ত। বাড়ির বিছানা চেয়ার দেরাজ আলমারি কাল থেকে এনে ফেলছে। এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আজ সকালে আগের বাড়ি থেকে খেয়ে ইস্কুলে গিয়েছিলাম আর সন্ধ্যার সময় বাইরে খেয়ে নতুন বাড়িতে এলাম। এসে দেখি জিনিসপত্র সব উলট পালট হয়ে রয়েছে। ঘরে আলো নেই। চিঠির কাগজপত্র দোয়াত কলম কিছুই খুঁজে পেলাম না। তাই মুখুয্যেদের বাড়িতে এসে চিঠি লিখে যাচ্ছি।.........

তোমরা কেমন আছ? খালি তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখবার জন্য এখানে এসেছিলাম। এখনি বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে জিনিস

পত্রের কি হল। তা না হলে কাল স্কুলে যাওয়া মুস্কিল হবে। তাড়াতাড়িতে কলার-টলার কোথায় গুঁজেছিলাম মনে নেই।

তোমরা কেমন আছ? আমি ভালো আছি।

স্নেহের তাতা

(১৪)

৮ই মার্চ, ১৯১২
লণ্ডন

টুনি,

তোর চিঠি পেয়েছি।......এখানে শুক্রবার আর শনিবার মিসেস্ রায়দের ট্যাব্লো হল। ঢের লোক হয়েছিল। মোটের উপর খুব ভালোই হয়েছিল। বোধ হয় প্রায় হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এখন-ও ঠিক বলা যায় না।

আসছে সপ্তাহে মিসেস্ রায়দের ওখানে 'আমরা' একটা ট্যাব্লো করব। সেটা ঐ ট্যাব্লোর-ই imitation-এ parody করা হবে। আমি লিখেছি, আর কয়েকজন মিলে অ্যাক্ট করব।

পরশুরাত্রে kinema color দেখতে গিয়েছিলাম। দরবারের সমস্ত দেখলাম—চমৎকার! কলকাতায় যা kinema color দেখেছিলাম, এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বুটুমাসির বিয়ে হয়ে গেছে?

এখানে পার্লামেণ্টে ভোট পাবার জন্য অনেক বছর ধরে মেয়েরা চেষ্টা করছে; তাদের suffragette বলে। একদল suffragette গত সপ্তাহ থেকে ভারি উৎপাত আরম্ভ করেছে। গত সপ্তাহে প্রায় ১৫০ মেয়ে হাতুড়ি হাতে হঠাৎ Regent Street-এর কাছের কতগুলো দোকানের উপর rush করে বড় বড় দামী জানলা ভেঙে ফেলল। পুলিস প্রায় একশো জনকে ধরে ফেলল। তাদের প্রায় সকলের-ই জেল হয়েছে।

তবু জানলা ভাঙার হুজুগ থামে না। রোজ-ই শুনছি বড় বড় দোকানে বা সরকারী আপিসে জানলা ভাঙা হয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে ৫ মিনিটের রাস্তা Harrods-এর দোকান, (এখানকার Whiteaway Laidlaw!) কাল ভোরে এক দল মেয়ে, (সব ভদ্র-লোকের মেয়ে, তার মধ্যে একজন Strand Magagineএর W. W. Jacobs-এর স্ত্রী) তার জানলা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এদের ভয়ে সপ্তাহখানেক ধরে মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি সব বন্ধ।

এখন চারিদিকেই হুজুগ। সপ্তাহখানেক থেকে coal strike আরম্ভ হয়েছে। এত বড় strike ইংল্যাণ্ডে আর হয়নি। এর মধ্যেই কারখানা, রেলওয়ে সব বন্ধ হয়ে আসবার মত হয়ে উঠেছে।

তোরা কেমন আছিস? আমি ভালো আছি।

দাদা

(১৫)

১লা মে

ম্যাঞ্চেস্টার

খুসী,

...আমি Easterএর ছুটিতে লণ্ডনে গেছিলাম।...আমার এখানের কাজ শেষ হয়েছে। আর ২।৪ দিনের মধ্যেই লণ্ডনে ফিরব।...

এখানে এখন গ্রীষ্ম সবে আরম্ভ হয়েছে। তার মানে এখন বিনা over-coatএ রাস্তায় বেরুনো চলে। দুপুর বেলায় অনেক সময় রাস্তায় চলতে গিয়ে একটু আধটু ঘাম দেখা যায়। লণ্ডনে বোধ হয় আরেকটু গরম পাব।...

গত শনিবার আমাদের এখানে Manchester Indian Associationএর annual dinner ছিল। তাতে স্কুলের Principal, Universityর Vice-Chanceller এঁরা ছিলেন।...

Dinner খুব ভালোই। তার পর বক্তৃতা, toasts আর গান।

আমি গান করলাম, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। এর আগেও আমাদের এক socialএ গান করেছিলাম। এতেই গাইয়ে বলে আমার ভয়ানক নাম হয়ে গিয়েছে।

Textile Departmentএর এক বুড়ো মাস্টার অমনি···আমার সঙ্গে আলাপ করল। বলল, 'By Gad! I thought you fellows could not sing! By Gad!'

···আমি সেই জাপানী ছেলেকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলাম। আমার পর তাকে গাইতে বলা হল। সে তো উঠেই···'মার মার কাট কাট গোছের' সুরে এক গান করল। আর তার পর দম্‌দম্‌-বম্‌বম্‌ গোছের কি একটা বলে শেষ করল। আমরা তো ভাবলাম খুব বুঝি লড়াই চলেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি war song?' সে বলল, 'No, love song.'

শুনে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠেছে।···

দাদা

(১৬)

পাইন হার্স্ট
বোর্ণমাউথ
১১ই এপ্রিল ১৯১২

বাবা,

গত শনিবার বোর্ণমাউথে এসেছি। লণ্ডন থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। একেবারে সমুদ্রের ধারে cliff-এর উপর শহর। রাস্তায় চলতে ক্রমাগত ওঠা আর নামা, অনেকটা দার্জিলিঙের কথা মনে হয়। ক'মাস লণ্ডনের একঘেয়ে বাড়িঘর দেখে এখন এসব যেন আর-ও ভালো লাগে। এর মধ্যে একদিন একটু মেঘলা হয়েছিল। তা না হলে···পরিষ্কার রোদ, শীত-ও কম, সকাল বিকাল খুব হাঁটি।

যেখানে রয়েছি এটা একটা বোর্ডিং বাড়ির মতো। Easter-এর ছুটিতে অনেকে বোর্ণমাউথে এসেছে। আমাদের এখানে প্রায় ৩০/৪০ জন লোক। আমার সঙ্গে একটি বাঙ্গালী ছেলে আছে, তার নাম হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। অবনীবাবুদের আর্ট স্কুলের ছাত্র, এখানে sculpture শিখছে।······বেশ সুন্দর কাজ করে, ছেলেও বেশ ভালো।

আমরা যে টেবিলে খাই সেই টেবিলে এক সাহেব আর মেম আর তাদের ছোট্ট মেয়েও, বছর ৩/৪ হবে, বসেন। সেই মেয়েটি যা মজার, চোখেমুখে কথা বলে। তার মা খাওয়া দেখিয়ে দিতে যান সে তা শুনবে না। এক হাতে প্রকাণ্ড এক চাম্‌চে নিয়েছে, আর এক হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে খাবারটা তাতে ঠেলে তুলছে। বলে, 'I do it this way, when I grow up like Mummy I'll use the fawk!' হিরণ্ময় লেমনেড খাচ্ছিল দেখে ও তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে—'Don't take it now, its too figgy, it'll get into your nose!'···

তাতা

(১৭)

জুন ২১; ১৯১২

খুসী,

······পরশুদিন Mr. Pearson, (যিনি ডাঃ রায়ের জায়গায় এখন আছেন) তাঁর বাড়িতে আমায় Bengali Literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন (করেছেন)। Mr. Pearson কিছু কিছু বাংলা পড়তে পারেন খুব ভালো মানুষ। সেখানে গিয়ে Mr. & Mrs Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein, Dr. P. C. Ray, Mr. Sarbadhikary প্রভৃতি অনেকে, তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম সব উপস্থিত।

শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। বুঝতেই পারছিস্, আমার কি রকম অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুজে পড়ে দিলাম। লেখাটার জন্যে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। India Office Library থেকে বইটই এনে materials যোগাড় করতে হয়েছিল। তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা কবিতা, ('সুদূর' 'পরশপাথর' 'সন্ধ্যা' 'কুঁড়ির ভেতরে কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ করেছিলাম। সেগুলো সকলের খুব ভালো লেগেছিল।···

···Mr. Cheshire আর Mr. Cranmer Byng (Northbrook-এর Secretary আর Wisdom of the East Seriesএর Editor) খুব খুশি হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে ধরেছে নআর-ও অনুবাদ করে দিতে, তিনি publish করবেন। বলছেন ছুটিতে তাঁর সঙ্গে তাঁর Country House-এ যেতে আর সেখানে বসে লিখতে।

Rothenstein আমার ঠিকানা নিয়ে গেলেন। বললেন, 'You must come to our place to dinner.'

তার পর Pearson-এর ছাতে গেলাম, সেখান থেকে Hampstead Heath-এর চমৎকার view পাওয়া যায়। Pearson লোকটা একটু ভাবুক গোছের। ছাতের উপর রীতিমতো বাগান বসিয়েছে। সেখানে রথী ঠাকুরের সঙ্গেও দেখা হল। রবিবাবু আমাকে দেখেই বললেন, 'এখানে এসে তোমার চেহারা improve করেছে।'

আমাদের এখন long vacation চলছে। September-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বন্ধ। তার পর L. C. C.-তেই থাকব কি Polytechnic-এ যাব বলতে পারি না।

নিরামিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। একেবারে একঘেয়ে রান্না; দেড়মাসে···অরুচি ধরিয়ে দিয়েছে। এখন এদের vegetable curry-র চেহারা দেখলে রাগ ধরে। সেদিন Pearson-এর সঙ্গে

Eustau Milesএর Vegetarian Restaurantএ খেতে গিয়েছিলাম, খুব সুন্দর লাগল। তার পর His Majesty's Theatre-এ Oliver Twist দেখতে গেলাম। খুব চমৎকার অ্যাক্ট করল। একটা scene ছিল London Bridge by moonlight, অদ্ভুত !

আমার ওজন এখন 13 stones 4 or 5 poundsএ, light overcoat ইত্যাদি সুদ্ধ, এসে থেমেছে। এই দুই মাস এই ওজন constant রয়েছে। বোধ হয় আর কমবে না।

....তোরা কেমন আছিস ?

দাদা

(১৮)

২৭শে জুন ১৯১২ ?

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

পরশু দিন এখানে আলেকজান্দ্রা উৎসব ছিল। সেদিন সব হাসপাতালের সাহায্যের জন্যে ফুল বিক্রি হয়। রাস্তাঘাটে চারিদিকে সাদা পোশাক পরে মেয়েরা ফুল বিক্রি করে। তাতে যা পয়সা ওঠে সব হাসপাতালের সাহায্যে (দেওয়া হয়)। আমরা রাস্তায় বেরুতেই আমাদের ধরে ৪।৫ জন ফুল গছিয়ে দিল। শেষটায় মুস্কিল দেখে একটা বাসে চড়ে পড়লাম। শুনছি শুধু ফুল বিক্রি করেই দেড় লক্ষ টাকার বেশী আদায় হয়েছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট সেদিন লণ্ডনে এসেছিলেন। দেখতে গিয়েছিলাম। রাজা, রাণী, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ সব দেখা হল।

গত শনিবার ব্রাহ্মসমাজে রবিবাবু কর্মযোগ বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক লোক হয়েছিল।......

স্নেহের তাতা

(১৯)

২৫শে জুলাই ১৯১২ ?

নি,

…আজ একটা বড় পার্টি আছে। মিসেস্ নাইডু আসবেন। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন হয়েছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Societyতে, 'The Spirit of Rabindranath' বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয়নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)—তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Questএ ছাপাচ্ছেন।

রবিবাবু দু সপ্তাহ nursing homeএ ছিলেন, কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন Royal Court Theatreএ তাঁর ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল। 'মালিনী' আর 'চিত্রাঙ্গদা'ও বোধ হয় শীগ্‌গির-ই কোথাও করা হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুব-ই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় poetরা রবিবাবুর নাম করতে পাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, Dr. Bridges, তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

আমি Uuiversityর টাকা পেলেই বোধ হয় Continentএ বেরিয়ে পড়ব। Parisএ ৮।১০ দিন, Germany আর Austriaয় সপ্তাহখানেক, তারপর Switzerland হয়ে, Italyতে ৮।১০ দিন কাটিয়ে, বোধ হয় Trieste থেকে কোনো জাহাজ ধরব। এখান থেকে বেরোতে এখনো মাস দেড়েকের বেশী বোধ হয়।…

দাদা

(২৪)

৯ই আগষ্ট ১৯১২ ?

মা,

……সেই যে একটা ফটোগ্রাফিক ক্লাবে আমি মাঝে মাঝে ছবি

পাঠাতাম, আজ তাদের ছবি দেবার শেষ দিন। তাই সমস্ত দিন ছবি প্রিন্ট করে দিতে ব্যস্ত ছিলাম।

……তোমাদের ফটো পেয়েছি। বেশ সুন্দর হয়েছে। দাদা-মশাইকে বড্ড রোগা দেখায়। বাবাকেও একটু রোগা বোধ হল। টুনি বেজায় মোটা হয়েছে।…

কাল থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। এর আগেও দু'একটা দেখেছি। কিন্তু কালকে ভারি মজার ছিল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লোকে ক্রমাগত হেসেছিল। রথীবাবুও…আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি এখন খুব কাছে একটা বাসা নিয়েছেন। সুতরাং রোজ-ই আমাদের এখানে আসেন। রবিবাবু উত্তরে কোথায় যেন গিয়েছেন।

গত সোমবার ব্যাঙ্ক হলিডে'র ছুটিতে প্রায় সমস্ত দোকান আপিস বন্ধ ছিল। সেদিন আমরা Hendonএ এয়ারোপ্লেন দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বাতাস ছিল বলে বেশি কিছু দেখলাম না। এখান থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের রেলওয়ে দিয়ে গেলে, গোল্ডার্স গ্রীন স্টেশন। সেখান থেকে বাসে হেণ্ডন যেতে হয়। বাস থেকে নেমেও মাইলখানেক হাঁটতে হয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি ভয়ানক ভিড়। প্রায় সকলেই হেণ্ডন যাচ্ছে। তবে এখানে সব কাজের-ই বন্দোবস্ত ভালো, কাজেই ধাক্কাধাক্কি করতে হয় না। লোকেরা সব ২।৩ জন করে সার বেঁধে লম্বা লাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও লাইনের পেছনে সার বাঁধলাম। এমনি করে প্রায় ২০।২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে বাসে জায়গা পেলাম।

তারপর হেণ্ডনে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু দেখা গেল না। লোকে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। খুব হাওয়া বলে ওড়া বন্ধ ছিল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত হাউই ছুঁড়ে লোকদের ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল। সে হাউই ফেটে নানা রকম নিশান ফানুস পুতুল এই সব বেরোয়। এক বেচারা এয়ারোপ্লেন আপিসের পিওন বাইসাইকেল্

করে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, লোকেরা তাকে খুব হাততালি দিতে লাগল।

তারপর একটা লোক এসে ফনোগ্রাফের সেই চোঙ্গার মতো একটা চোঙ্গা মুখে দিয়ে ভয়ানক চীৎকার করে বলে গেল—মিস্টার ডিস্যুজা এখন এয়ারোপ্লেনে করে উড়বেন। কিন্তু এয়ারোপ্লেনটার কি গোলমাল ছিল, কিছুতেই উড়ল না—কয়েক হাত উঠেই ধপ্ করে লাফিয়ে পড়ল।

আমরা তখন বাড়ি ফিরব মনে করছিলাম, এমন সময় কয়েকটা এয়ারোপ্লেন মাঠের মাঝে থেকে উড়ে উঠল। ½ ঘণ্টা খানেক বেশ দেখা গেল।

আসবার সময় বাস পাওয়া গেল না। আধঘণ্টা হেঁটে গোল্ডার্স গ্রীনের বাস ধরলাম। বাড়ি ফিরতে ৮৷৷টা হয়ে গেল। সাধারণতঃ ৭টার সময় ডিনার খাই। খুব খিদে পেয়েছিল আর রান্নাও বেশ করেছিল। দুজন খেতে আসেনি, তারা অন্য কোথায় খেতে গিয়েছিল। আমরা তিনজনে মিলে পাঁচজনের খাবার খেয়ে ফেললাম।

তোমরা কেমন আছ? আমি ভালো আছি।

স্নেহের তাতা

(২১)

১৬ই আগস্ট
১৯১২

বাবা,

···গতকাল খুসীর চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে তুমি কি একটা ছবি আঁকছিলে। কোন নতুন painting কি?

এবার Process Engravers' Monthly-তে Verfasser-এর বইয়ের review করেছে। তার মধ্যে automatic screen adjustment-এর কথায় বলেছে যে ওটা practical কাজে আসা

সম্বন্ধে অসুবিধা এই যে বড় complicated হয়ে পড়ে। আর তাছাড়া ওটা কেবল এক রকমের original হলেই ব্যবহার করা চলে। নানান রকম কপি হলে আর machineএ কুলিয়ে ওঠে না। আমি এ কথাটায় একটু protest করে, screen adjusting machine-এর aims আর scope সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। তার একটা কপি তোমাকে পাঠাব।...

সেদিন Mr. Rothenstein-এর ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি রবিবাবুর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর sketch করেছেন। তার কয়েকটা কপি করে রামানন্দবাবুকে পাঠাব। আমাকে একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে sitting দিতে বলেছেন। রামানন্দবাবুর সেই ছবিগুলো পাঠাচ্ছি। তাছাড়া দু'একটা ছবি থেকে autochrome করে পাঠাব। তার থেকে three-colour করলে বোধ হয় বেশ হবে। এখানে এসে কয়েকখানা খুব সুন্দর autochrome করেছি। Art Gallery-তে কাজ করবারও অনুমতি যোগাড় করছি।

স্নেহের তাতা

(২২)

ট্রেভোস সোয়ানেজ

২রা জানুয়ারি ১৯১৩

বাবা,

মঙ্গলবার বুবা (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) আর মেসোমশাইয়ের (সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের) সঙ্গে এখানে এসেছি। কয়েকদিন থেকেই ম্যাঞ্চেস্টারে ফিরব।

এ জায়গাটা অতি সুন্দর। বোর্নমাথের চেয়ে অনেক নির্জন আর দেখতেও সুন্দর। এসে বেশ লাগছে, খুব খিদে আর ভালো ঘুম হয়। এখানে New Year's Day সম্বন্ধে এদের একটা কথা

আছে যে কোনো dark লোকে যদি বাড়িতে New Year আনে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার পরে প্রথম যদি একজন dark লোক বাড়িতে আসে, সেটা ভারি lucky! সেই জন্য ম্যাঞ্চেস্টারেও ঐ সময়ে তাদের বাড়ি যাবার জন্যে অনেক লোক বলেছিল। কেউ কেউ কোনো দেশী ছেলেকে ৩১শে ডিসেম্বর নেমন্তন্ন করে রাত বারোটা পর্যন্ত আটকে রেখে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখানেও সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত লোকে খুব গানটান করেছে, আমাদের ঘুমোতে দেয়নি।

সেই collotype-এর কয়েকটা প্রুফ তোমাকে পাঠাব বলে আজ দু তিন সপ্তাহ হল রেখেছি। এর মধ্যে গ্যাম্ব্‌ল্‌ সাহেব সেগুলো দেখতে চেয়েছেন, তাই পাঠাতে পারিনি। আসছে মেলে পাঠাতে পারব।

June পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারের course, তারপরে এসে মাস দুই কেবল ভালো ভালো firm আর printing works ইত্যাদি দেখা আর সকল রকম information জোগাড় করব। তারপর Continent হয়ে দেশে ফিরব।...

স্নেহের তাতা

(২৩)

১২ থর্নক্লিফ গ্রোভ
হুইটওয়ার্থ পার্ক
ম্যাঞ্চেস্টার
৯।১।১৩

টুনি,

...মাঘোৎসবের সব খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্‌, মনিকেও লিখতে বলিস। আমি মাঘোৎসবের সময় week-end ticket করে লণ্ডনে যাব। সেখানে মাঘোৎসব হবে।

ছুটিতে কয়েকদিন লণ্ডনে আর সোয়ানেজে বেশ কাটিয়ে এলাম।

আবার এসে ম্যাঞ্চেস্টারের ধোঁয়া আর অন্ধকারে কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। আজ বুকপোস্টে একটা ফটো (গ্রুপ, গত নভেম্বারে তোলা) আর কয়েকটা collotype প্রুফ পাঠালাম।

ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটখানা পেয়েছি। ম্যাঞ্চেস্টারের ঠিকানায় পাঠানোর দরুন কোন অসুবিধা হয় নি। কারণ এখানে আরও দু একজন ছেলে ছিল।

পিয়ার্সন সাহেবের চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাদের ওখানে গিয়ে খুব খুসী হয়েছেন। লিখেছেন, 'আমি তোমার ভাইকে দেখেই চিনেছি যে তোমার ভাই।' মনিকে জিজ্ঞাসা করিস্ ও Process Year Book পেয়েছে কি না।

আমাদের এখানে আজ দু' দিন ধরে খুব পরিষ্কার রোদ হচ্ছে, শীতও কিছু কম। এর পরেই যদি ঠাণ্ডা আসে তবে খুব বেশি frost হবার সম্ভাবনা।

দাদা

(২৪)

হুইটওয়ার্থ পার্ক
ম্যাঞ্চেস্টার
১০ই এপ্রিল ১৯১৩

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

টুনির engagement-এর কথা গতবারেই বাবার চিঠিতে পেয়েছি। এখানে অনেকেই প্রভাতের কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে। প্রভাত এখন কোথায় আছে ? তার কাজের কি রকম হল ?...

এখানে ক'দিন ধরে বড় বিশ্রী দিন করেছে, কেবল মেঘলা আর বৃষ্টি। আবার যেন একটু শীত পড়েছে। আমাদের বাড়ির প্রায় সামনেই বেশ বড় খোলা পার্ক। আশেপাশেও বাড়ি ভালো।

আজকাল ক্রমেই দিন লম্বা হয়ে আসছে। আর মাসখানেকের মধ্যে রাত দুটো থেকে ভোর আরম্ভ হবে। তখন রাত ৯।১০টা পর্যন্ত বেশ আলো থাকবে। এবারে গতবারের চেয়ে শীত অনেক কম হয়েছে।...

এবারের প্রবাসী পাইনি। হয়তো এই ডাকেও পেতে পারি। প্রশান্ত মহলানবীশ বিলাত আসছে শুনলাম। এতদিনে হয়তো লণ্ডনে এসেছে। এল কি না জানবার জন্য বুবাকে চিঠি লিখছি।

মে মাসে রবিবাবু আমেরিকা থেকে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য শুনলাম লণ্ডনে খুব বড় রকমের আয়োজন হচ্ছে। মিসেস পি কে রায় বলেছিলেন তাঁরা ফেব্রুয়ারির শেষে দেশে ফিরবেন। শুনলাম তাঁরা এখনো লণ্ডনে আছেন। এবার লণ্ডনে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ঠিকানা জানতাম না।

অক্টোবরে সম্ভবতঃ দেশে ফিরব। অনেকে সে সময়ে ফিরবে, কাজেই সঙ্গীর অভাব হবে না।...

স্নেহের তাতা

সংযোজন ঃ সুকুমার রায়ের রচনা

॥ ১ ॥

ভাবুক সভা

পাত্রগণ

ভাবুকদাদা
প্রথম ভাবুক
দ্বিতীয় ভাবুক
ভাবুক দল

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুক দলের প্রবেশ]

১ম ভাবুক—ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা ?
ভাবুক দাদা মূর্চ্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !

২য় ভাবুক—তাই তো বটে ! আমি বলি এত কি হয় সহ্য ?
সকাল বিকাল এমনধারা ভাবের আতিশয্য !

১ম ভাবুক—অবাক্ কল্‌লে ! ঠিক যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম !

২য় ভাবুক—(যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুব-ই
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু-গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কর নাকো বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু।
ক্ষণজন্ম পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

বিলাপ সঙ্গীত

ভাবনদী পার হবি কে চড়ে ভবের নায় ?
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে
ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল ?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই, ভবের পটোল তোল।
শান বাঁধানো মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোক্কা দিলে বাক্য-মানিক ঝরে রে মন,
বাক্য-মানিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়,
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।
(কীর্তন জমাট হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি)

ভাবুকদাদা—জুতিয়ে সব করব সিধে, বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট !

১ম ভাবুক—ঘুম কি হে ? সি কি কথা ? অবাক্ কল্লে খুব !!
ঘুমোও নি তো, ভাবের স্রোতে দিয়েছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে,—তেলী মুদি চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

ভাবুকদাদা—সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভবের রং ;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।

১ম ভাবুক—তাই তো বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি,
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি।

২য় ভাবুক—হাঃ হাঃ হাঃ—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা !
ভাবুকদাদা—ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলেম স্বপ্ন চমৎকার,
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায়।
মাভৈ রবে ডাকছি সবে, খুঁজছি ভাবের রাস্তা,
এই ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা !
১ম ভাবুক—যা হবার তা হয়ে গেছে—বলে গেছেন আর্য,
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।
২য় ভাবুক—কি আশ্চর্য ভাবতে গেলে কাঁটা দিচ্ছে মশায়,
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায় !
ভাবুকদাদা—অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি,
তার ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি তোরা কি ?
২য় ভাবুক—পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি,
পায়ের ধুলো দাও তো দাদা, মাথায় একটু মাখি।
ভাবুকদাদা—সবুর কর, স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও এক্ষনি।
(ভাবের ধাক্কা)

১ম ভাবুক—বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন,
আক্কেল বুঝি জড়তাপন্ন।
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা, এত কি দুঃখ ?
২য় ভাবুক—সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়।
একেবারে পড়ে গেলে ভাবের পাতকোয় !

ভাবুকদাদা—শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য।
নাচে ল্যাগব্যাগ তাণ্ডব তালে,
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।
জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা,
শূন্যে শূন্যে খুজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।

২য় ভাবুক—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ শোন হুড়দাড় মারমার শব্দ
দেবাসুর পশু নর ত্রিভুবন স্তব্ধ।

১ম ভাবুক—বাজে শিঙ্গা ডমরু শাখ জগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প।

ভাবুকদাদা—কিসের তরে দিশেহারা, ভাবের ঢেঁকি পাগলপারা
আপনি নাচে নাচে রে।
ছন্দে ওঠে, ছন্দে নামে, নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে!
রক্ত আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি,
নৃত্যে মাতে মাতে রে।

১ম ভাবুক—চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা,
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোস্কা।
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে!
ডুবজলে হাবুডুবু, কর দাদা রক্ষে!

২য় ভাবুক—সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ!

ভাবুকদাদা—অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাত মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।

যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
অর্থ অর্থ করি খুজে মরে ভাগাড়ে !
আরে, অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম ?
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম ?
অভিধান, ব্যাকরণ আর ঐ পঞ্জিকা,
ষোল আনা বুজরুকি, আগাগোড়া গঞ্জিকা !
মাখন তোলা দুগ্ধ আর লবণহীন খাদ্য,
আর ভাবশূন্য গবেষণা এ কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ?

ভাবের নামতা

ভাবের পিঠে রস, তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মানিক, বাড়বে কত পুণ্যি ।
(ওরে মানিক মানিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিস্‌পেপসিয়া, ঢেকুর উঠবে চোঁয়া ।
(ওরে মানিক মানিক রে চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়,
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, গাছের থেকে পড় ।
(ওরে মানিক মানিক রে, এবার গাছে চড় খানিক রে)

যবনিকা পতন

॥ ২ ॥

খিলিখিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,
একটা শুধোয় আরেকটাকে, তুই বেড়াল না মুই বেড়াল !
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু, চিৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড় কামড় চরকি বাজি, ধাঁই চটাপট চড় চালায় ।
খামচা খাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো,
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম-ধুনুরির তুলোর মতো ।

তর্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড় দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

॥ ৩ ॥

উঠোন-কোণে কড়াই ছিল,
পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে,
কুঁকড়ো বুড়োর সাথে।
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি,
তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াই পাখি
পায়েস্ গেছে খেয়ে!

॥ ৪ ॥

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'ডাকাতে ধরেছিল? বলিস্ কিরে!' ডাকাত না তো কি? বিকালবেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময়, ডাকাতরা তাকে ধরে মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্। নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে, রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাস্তায় সঙ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল?' নবীনচাঁদ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—'; শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, 'ফের জ্যাঠামি!'

নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ সত্যি সত্যি-ই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, এ কথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল। যা হোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল। কারণ স্কুলের অন্ততঃ অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল। এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে, ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুইয়ের আঁচড়টাকে পুরনো বলে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল, হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল, সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, 'ওটা তো জুতোর ফোস্কা।' তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বলল, 'যাও, তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।' কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে-যার ক্লাসে চলে গেলাম। এমন সময় দেখি পাগলা দাশু এক গাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস্, কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।' যেমন বলা অমনি দাশরথী হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে, বই-টই ফেলে খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ করে, হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা অবাক্!

পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসেছেন, তখন-ও পুরোদমে তার হাসি চলেছে। সবাই ভাবল, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল নাকি?' যা হোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ও-রকম হাসছিলে কেন?' দাশু নবীনকে

দেখিয়ে বলল, 'ঐ, ওকে দেখে।' পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে, তাকে ক্লাসের কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই। সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে, ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল। 'কি রে দেশো, বড় যে হাসতে শিখেছিস্!' দাশু বলল, 'হাসব না? তুমি কাল ধুচনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি। দেখলে বুঝতে কেমন মজা!'

আমরা সবাই বললাম, 'সে কি রকম? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে?'

দাশু বলল, 'তাও জান না? ঐ কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা! বলতে না বারণ করেছিল!' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি বলছিস্ ভালো করেই বল না।' দাশু বলল, 'কালকে শেঠদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল। এমন সময় দুটো ছেলে, তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচনির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।'

নবু ভয়ানক রেগে বলল, 'তুই তখন কি করছিলি?' দাশু বলল, 'তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছ দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তাই আমি তোমার বড়মামাকে ডেকে আনলাম।'

নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক। সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না। তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম।

ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'তবে যে নবীনদা বলছিল তাকে ডাকাতে ধরেছে?' দাশু বলল,

'দূর বোকা, কেষ্টা কি ডাকাত ?' বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল, কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না। খানিক-ক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। আমরা ভাবলাম গোল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি নবীন তার দাদা মোহন-চাঁদকে নিয়ে হন্ হন্ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়। তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখে আমরা বুঝলাম এবার একটা কাণ্ড হবে।

মোহন এসেই বলল, 'কেষ্টা কই ?' কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বলল, 'ঐ দাশুটা সব জানে। ওকে জিজ্ঞাসা কর।'

মোহন বলল, 'কি হে ছোকরা, তুমি সব জান নাকি ?' দাশু বলল, 'না, সব আর জানব কোত্থেকে—এই তো সবে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেটরি—' মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা ?' দাশু বলল, 'ঠেঙায়নি তো, মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।'

মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, 'খুব অল্প মেরেছে, না ? তবু কতখানি শুনি।'

দাশু বলল, 'সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।' মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি ? কি রকম মারলে পর লাগে ?'

দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বলল, 'ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমাকে যেমন বেত মেরেছিলেন, সেই-রকম।'

এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে চিৎকার করে বলল, 'দ্যাখ, বেয়াদব, ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি দেখেছিলি, সব খুলে বলবি কিনা ?'

জানই তো দাশুর মেজাজ কি রকম পাগলাটে গোছের। সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে, তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল ঘুঁষি চড়, আঁচড় কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে। তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে, কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।'

ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা যদি মোহনকে সামলিয়ে না ফেলত, তা হলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন ?' কেষ্টা বলল, 'ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ও-রকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে এক সের জিলিপি পাবি।' আমরা বললাম, 'কৈ, আমাদের তো ভাগ দিলি নে ?'

কেষ্টা বলল, 'সে-কথা আর বলিস্ কেন! জিলিপি চাইতে গেলাম, হতভাগা বলে কিনা, আমার কাছে কেন ? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস্ জিলিপি পাবি।'

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে ?

॥ ৫ ॥

বর্ণমালাতত্ত্ব

পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া, এ দীন দুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিত, জড়-সন্ধিতে, বস্তু-পিণ্ড ফাঁকে,
অণু-অবকাশে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড, আকাশ প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে—
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
ইথার পাথারে তড়িৎ বিকারে, জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে।
শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা প্রাঙ্গণে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।
স্বর-ব্যঞ্জন যেন দেহ-মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আরে থাকিতে না পারে, প্রাণ-হারা যেন প্রাণী।
দোঁহে ছাড়ি দোঁহে, মূক রহে মোহে, ভাষার বারতা ভুলি,
স্বরের নিশ্বাসে, আহা উহু ভাষে, ব্যঞ্জনে নাহি বুলি।
স্তিমিত-চেতন জগৎ যখন, মগন আদিম ধূমে,
অঘোর তিমির, স্তব্ধ বধির, স্বপ্ন-মদির ঘুমে;
আকুল গন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কি যেন রয়েছে মিশি।
জাগে হা-হুতাশ, স্বরের বাতাস, জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি,
ফিরে দিশাহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি!
অ-আ-ই-ঈ-উ-ঊ হা হা হি হি হু হু হালকা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের চলন, নিশ্বাসে আসা যাওয়া,

খেলে কিনা খেলে, ছায়ার আঙুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,
আলস বিভোর আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।
ভাবে কুল নাই, শুধু ভেসে যাই, যুগে যুগে চিরদিন,
কাল হতে কালে, আপনার তালে অনাহত বাধাহীন।
অকুল অতলে অন্ধ অচলে, অস্ফুট অমানিশি,
অরূপ আঁধারে আঁখি অগোচরে, অণুতে অণুতে মিশি।
আসে যায় আসে, অবশ আয়াসে, আবেগে আকুল প্রাণে,
অতি আনমনা, করে আনাগোনা, অচেনা অজানা টানে,
আধো আধো ভাষা, আলেয়ার আসা, আপনি আপন হারা,
আদিম আলোতে, আবছায়া পথে, আকাশ-গঙ্গা ধারা।
ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয় দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইশারা আভাসে, ঈঙ্গিতে ভাষে, রহ রহ ইহকালে।
কেন ইতি উতি, উতলা আকূতি, উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে উর্ধ্বমুখী।
হের একবার. সবি একাকার, একেরি এলাকা মাঝে
ঐ ওঠে—শুনি, ওঙ্কার ধ্বনি, একূলে ও কূলে বাজে।
ওরে মিথ্যা এ আকাশ-চারণ, মিথ্যা তোদের খোঁজা,
স্বর্গ তোদের বস্তু সাধনে, বহিতে জড়ের বোঝা।
আকাশ বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,
আইল আকাশে ফোকলা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।
সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার কর নি, শাস্ত্র পড় নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া, ঠাসিবে ভাষার কাদা।
শাস্ত্র বিধান কর প্রণিধান, ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন-স্বরে, যেন হরি-হরে, কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরম পরশে বাতাস লাগিলে হাড়ে,
ভাষার প্রবাহ পুলক কম্পে, জড়ের জড়তা ছাড়ে।

(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয় ধরণী-ধূলায়, কীর্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠে-বর্ণে কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে, প্রভাতে কাকের রবে।

নমো নমো নমঃ, সৃষ্টি প্রথম, কারণ জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী, প্রথম কৌতূহলে ;
আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনককিরণমালা,
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্বজঠরে প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে—কই কেগো কোথায় কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি ?
কহে—কহ কহ কেন অহরহ, কালের কবলে থাকি ?
কহে কানে কানে করুণ কূজনে, কলকল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে, কাষ্ঠ-কঠোর হাসে।
কহে কটমট, কথা কাটা কাটা, কেওকেটা কহ কারে ?
কাহার কদর কোকিল কণ্ঠে, কুন্দ কুসুম হারে ?
কবি-কল্পনে, কাব্যে কলায়, কাহারে করিছ সেবা ?
কুবের কেতনে, কুঞ্জ কাননে, কাঙাল কুটিরে কেবা ?
কায়দা কানুনে, কার্যে কারণে, কীর্তি-কলাপ মূলে,
কেতাবে কোরাণে, কাগজে কলমে, কাঁদায়ে কেরানীকুলে ?
কথা কাঁড়ি-কাঁড়ি, কত কানাকড়ি, কাজে কচু কাঁচকলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্তা কলার, কভু কৌপীন ঝোলা।
কুটিল কৃপণে, কুৎসা কথনে, কুলীন কন্যাদায়ে,
কর্ম-ক্লান্ত, কালিমা-কান্ত, ক্লিষ্ট কাতর কায়ে।
কলে কৌশলে, কপট কোঁদলে, কঠিনে কোমলে মিঠে—
ক্লেদ-কুৎসিত, কুষ্ঠ কলুষ, কিলবিল কৃমি কীটে।
'ক'য়ের কাঁদনে কাংস্য ক্বণনে, বস্তু চেতন জাগে,
অকাল-ক্ষুধিত খাই-খাই রবে, বিশ্বে তরাস লাগে।

আকাশ অবধি ঠেকিল জলধি, খেয়াল জেগেছে খ্যাপা।
কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়, দেখ কি বিষম হ্যাঁপা!
(খালি) করতালে কভু কীর্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটিপেটা।
নামাও আসরে কয়ের দোসরে, খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা।

এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলে নি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া, কি খেলা খেলিল পাখি।
খোল খরতালে, খোলসা খেয়ালে, খোল খোল খোল, বলে
শখের খাঁচার খিড়কি খুলিয়া খঞ্জ-খেয়াল চলে।

প্রখর ক্ষুধিত তোখড় খেয়াল, খেপিয়া রুখিল ত্বরা,
চাখিয়া দেখিল খাসা এ অখিল, খেয়াল-খচিত ধরা।
খুঁজি সুখে দুখে, খেয়ালের ভুলে, খেয়ালে নিরখি সবি,
খেলার খেয়ালে নিখিল খেয়াল লিখিল খেয়াল ছবি।

খেয়ালের লীলা খদ্যোৎ শিখা, খেয়াল খধূপ ধূপে,
শিখী পাখা পরে, নিখুঁত আখরে, খচিত খেয়াল রূপে।
খোদার উপরে খোদকারি করে, ওরে ও ক্ষিপ্ত মতি,
কীলিয়ে অকালে কাঁঠাল পাকালে, আখেরে কি হবে গতি?

খেয়ে খুরো চাঁটি, খোল কহে খাঁটি, 'খাবি খাব, ক্ষতি নাই।'
খেয়ালের বাণী করে কানাকানি—গতি নাই, গতি নাই।
গতি কিসে হবে, চিন্তিয়া তবে, বচন শুনিনু খাসা,
পঞ্চ-কোষের প্রথম খোসাতে, অন্ন রয়েছে ঠাসা।
আত্মার মুখে আদিম অন্ন, তাহে ব্যঞ্জনগুলি,
অনুরাগে লাগি, করে ভাগাভাগি, মুখে মুখে দাও তুলি।

এত বলি ঠেলি, আত্মারে তুলি, তত্ত্বের লগি ধরি,
খেয়ালের প্রাণী রহে চুপ মানি, বিস্ময়ে পেট ভরি।
কবে কেবা জানে, গতির গড়ানে, গোপন গোমুখী হতে,
কোন ভগীরথে গলাল জগতে গতির গঙ্গা স্রোতে।

দেখ আগাগোড়া, গণিতের গড়া, নিগূঢ় গণন সবি
গতির আবেগে, আগুয়ান বেগে, অগণিত গ্রহ রবি।
গগনে গগনে গোধূলি লগনে, মগন গভীর গানে,
করে গম গম আগম-নিগম, গুরু-গম্ভীর ধ্যানে।
গিরি-গহ্বরে অগাধ সাগরে ; গঞ্জে নগরে গ্রামে,
গাঁজার গাজনে, গোষ্ঠে-গহনে, গোকুলে, গোলক-ধামে।
বিকল অঙ্গ, ভগ্ন-জঙ্ঘ, এ কোন পঙ্গু মুনি ?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল, বাঙালা মুলুকে শুনি ?
রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হবে বলে, ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ ধরি, ব্যাঙাচির মতো, লাঙুলে জুড়িয়া ফিরি ?
টলিল দুয়ার চিত্ত গুহার, চকিতে চিচিং ফাঁক,
শুনি কলকল ছুটে কোলাহল, শুনি চল চল ডাক।
চলে চটপট চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে,
চল চিত্রিত চির চিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।
চলে চঞ্চলা চপল চমকে, চারু চৌচির বক্রে,
চলে চন্দ্রিমা, চলে চরাচর, চড়ি চড়কের চক্রে।
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চিৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।
চলে চুপিচুপি চতুর চৌর, চৌদিকে চাহে ত্রস্ত,
চলে চূড়মণি চর্বে চোষ্যে, চটি চৈতনে চোস্ত।
চিকন চাদর চিকুর চাঁচর, চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাং ব্যাং, চিতল কাতল, চলে চুনোপুটি ট্যাংরা।

[রচনা অসমাপ্ত]

॥ ৬ ॥

হ-য-ব-র-ল

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাও!'

কি আপদ, রুমালটা ম্যাও করে কেন?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটাসোটা লাল টকটকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।'

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তা হলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকার বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।'

বেড়াল বলল, 'বেড়াল-ও বলতে পার, রুমাল-ও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দু-ও বলতে পার।'

আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?'

শুনে বেড়ালটা বলল, 'তাও জান না?' বলে এক চোখ বুজে বিশ্রী ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার

সেই-রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না।'

বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?'

আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জান?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানি নে? কলকোতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।'

আমি বললাম, 'তা হলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?'

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তা হলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?'

বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।'

আমি বললাম, 'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'কি রকম?'

বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জান? মনে কর তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, শুনবে তিনি আছেন রামকেষ্টপুরে। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তা হলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই। তারপর হিসেব করে দেখতে হবে,

দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে, তারপর দেখতে হবে—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব ?'

বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম ?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি।' বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আরেকটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছো বৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দুর ছাই ! কি সব আবোল-তাবোল বকছ, একটুও ভালো লাগে না।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা, তা হলে আরেকটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।'

আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয় ?'

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে ? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি,

এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটা দাঁড়কাক স্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি, বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।'

কাকটা অমনি দুলে দুলে বলল 'হয় নি, হয় নি, ফেল।'

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।'

কাকটা কিছু জবাব দিল না। খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?'

কাক বলল, 'তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে চোদ্দ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনি নি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। এক ঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?'

আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?'

কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তা হলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করার যো নেই। এই তো সেদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।'

বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময় হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুরুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো, তাতে কলকে-টলকে কিছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিগ্‌গেস করল, 'কই, হিসেবটা হল ?' কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।'

বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য ! উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না ?'

কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিগ্‌গেস করল, 'কতদিন বললে ?'

বুড়ো বলল, 'উনিশ।'

কাক অমনি গলা উঁচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি !'

বুড়ো বলল, 'একুশ,' কাক বলল, 'বাইশ।'

বুড়ো বলল, 'তেইশ।' কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ।'

ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে ?'

আমি বললাম, 'খামকা ডাকতে যাব কেন ?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখে নি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন-বন করে আট দশ পাক ঘুরে, আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তারপর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে

লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরনো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শূওর?'

বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।'

দেখলাম ফিতের লেখাটেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা-কিছু মাপে সব-ই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিগ্‌গেস করল, 'ওজন কত?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

বুড়ো তার দুটো আঙ্গুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে টিপে বলল, 'আড়াই সের।'

আমি বললাম, 'সে কি, পটলার ওজন-ই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।'

কাকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।'

বুড়ো বলল, 'তা হলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়স সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দুৎ। আমার বয়স আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগ্‌গেস করল, 'বাড়তি না কমতি?'

আমি বললাম, 'সে আবার কি?'

বুড়ো বলল, 'বলি বয়সটা এখন বাড়ছে না কমছে?'

আমি বললাম, 'বয়স আবার কমবে কি?'

বুড়ো বলল, 'তা নয়তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি? তা হলেই

তো গেছি! কোন দিন দেখব বয়স বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশী পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

আমি বললাম 'তা তো হবেই। আশী বছর বয়স হলে মানুষ বুড়ো হবে না!'

বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! আশী বছর বয়স হবে কেন? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়স ঘুরিয়ে দিই। তখন আর এক-চল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না, উনচল্লিশ আটত্রিশ সাঁইত্রিশ করে বয়স নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে, তখন আমার বয়স বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়স তো কত উঠল নামল, আবার উঠল, এখন আমার বয়স হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও। আমার হিসেবটা চটপট সেরে নি।'

বুড়ো অমনি চট্ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকোতে চুলকোতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—তারপর এদিকে বড় মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসুতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ-মাউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোকলস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার-মার কাট-কাট—এর মধ্যে রাজা হঠাৎ বলে উঠলেন, পক্ষীরাজ যদি হবে, তা হলে ন্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র-মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বলল, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুরসুর করে পালাতে লাগল।'

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?'

আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?' বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। আমি পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভূশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি ১।/০। Children Half Price অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়স-বংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, 'কেমন হয়েছে?'

আমি বললাম, 'সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।'

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এসেছিল, তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ, ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর স্লেট ফাটিয়ে দেব।'

কাক একটু থতমত খেয়ে কি ভাবল, তারপর বলল, 'টেকো নয়, টেপো মাথা, যে-মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে গজ-গজ করতে লাগল, কাক বলল, 'হিসেবটা দেখবে নাকি ?'

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে ? কই দেখি।'

কাক অমনি, 'এই দেখ।' বলে তার স্লেটখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোট ছেলেদের মত ঠোঁট ফুলিয়ে, ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা, বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি ? ষাট ষাট।'

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, 'একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—'

কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।'

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না ?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই তো। কি হিসেব হল পড় দেখি।'

আমি স্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ মালিক দখলিকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত ব-দস্ত কায়েম মোকররি পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—'

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এ-সব কি লিখেছ আবোল-তাবোল ?'

কাক বলল, 'ও-সব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকসমতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এ-সব বলে নিতে হয়।'

বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না?'

কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে শেষ দিকটা পড় তো।'

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ⁄২॥ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্-সি-এম্ও নয়, জি-সি-এম্ ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তা হলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিগ্‌গেস করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো, বুধো রে!'

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস্?'

বুড়ো বলল, 'কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।'

আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে?'

বুড়ো বলল, 'বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ!'

তেড়ে উত্তর এল, 'কাকে বলছে, ভগ্নাংশ, তোকে না আমাকে?'

বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক?'

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।'

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে

বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি। ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।'

কাক বলল, 'তা হলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে খাঁটি হলে দু টাকা চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।'

বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখম তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার স্লেট আর এই নাও পয়সা ছটা।'

পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি। সে টাক-ডুমাডুম টাক-ডুমাডুম স্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক-টাক বলছিস্? দাঁড়া। ওরো বুধো, বুধো রে! শিগগির আয়। আবার টাক বলছে।' বলতে না বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, 'ওঠ্ বলছি, শিগগির ওঠ্!' বলে ধাঁই ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

কাক আমার দিকে চোখ মটকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলা সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়-মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্টুপিড্ উধো!'

উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুঁকো বাগিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো !'

কাক বলল, 'লেগে যা, লেগে যা, নারদ-নারদ !'

অমনি ঝটাপট, খটাখট, দমাদম, ধপাধপ। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর বুধো ছটফট করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে ?'

উধো কাঁদতে লাগিল, 'ওরে হায় হায় ! আমাদের বুধোর কি হল রে।'

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশ মেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।